এযাবৎ প্রকাশিত পুনর্জন্মের ব্যাখ্যার সবচেয়ে সহজ উপলব্ধিগত উপস্থাপন

জীবন কখনও জন্ম দিয়ে শুরু হয় না অথবা মৃত্যু দিয়ে শেষ হয় না। বর্তমান দেহটি ত্যাগ করার পর আত্মার তাহলে ঠিক কি ঘটে? সেটি কি আরেকটি দেহে প্রবেশ করে? আত্মাকে কি চিরকাল ধরে জন্মান্তরিত হতে হয়? জন্মান্তর প্রক্রিয়াটি ঠিক কিভাবে কাজ করে? আমাদের ভবিষ্যৎ জন্মান্তরসমূহকে কি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি?

পুনরাগমন এই সমস্ত গভীর ও রহস্যময় সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছে জীবনের পর পার সম্বন্ধীয় পৃথিবীর অনাদিকালীন জ্ঞানভাণ্ডারের প্রামাণিক তথ্যের ভিত্তিতে, সহজ ভাষায়, স্বচ্ছ ও পূর্ণ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

পুনরাগমন

পুনর্জন্মের বিজ্ঞান

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

নির্দেশিত শিক্ষার ভিত্তিতে সংকলিত

পুনরাগমন

পুনর্জন্মের বিজ্ঞান

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ
শ্রীমদ্ভাগবত (১ম-১২শ স্কন্ধ, ১৮ খণ্ড)
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (৪ খণ্ড)
গীতার গান
গীতার রহস্য
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীউপদেশামৃত
দেবহূতি নন্দন কপিল শিক্ষামৃত
কুন্তীদেবীর শিক্ষা
ভালবাসার শিক্ষা
শ্রীঈশোপনিষদ
যোগসিদ্ধি
কৃষ্ণভাবনার অমৃত
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
জীবন আসে জীবন থেকে
বৈদিক সাম্যবাদ
অমৃতের সন্ধানে
ভগবানের কথা
ঈশ্বরের সন্ধানে
কৃষ্ণ বড় দয়াময়
পরম পিতা
শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে
কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান
কৃষ্ণভক্তি প্রচারই প্রকৃত পরোপকার
হরেকৃষ্ণ চ্যালেঞ্জ
পরলোকে সুগম যাত্রা
প্রকৃতির নিয়ম ঃ যেমন কর্ম তেমন ফল
জীবন জিজ্ঞাসা
বুদ্ধিযোগ
জ্ঞান কথা
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (পাক্ষিক পত্রিকা)

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
ডি. বি-৪৫
সল্টলেক
কলকাতা—৭০০০৬৪

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পুনরাগমন

পুনর্জন্মের বিজ্ঞান

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
নির্দেশিত শিক্ষার ভিত্তিতে সংকলিত
ইংরেজী Coming Back গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস এ্যাঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, রোম

Coming Back (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ,
৫০০০ কপি।

মুদ্রণ ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫, ২৪৫-৫৭৮

"আমি দৃঢ়রূপে নিশ্চিত যে সত্যিই এমন কিছু রয়েছে যা পুনরায় জীবিত থাকে, আর সেই জীবিত থাকা মৃত্যু থেকে উৎসারিত হবার পরেই ঘটে আর তাই মৃতের আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে।"

—সক্রেটেস

"আত্মা বাহির থেকে মানব শরীরে আসে, যেন সেটি তার ক্ষণিকের আবাস, এবং আবার তা নতুন দেহের কাছে যায়...সে যায় অন্যান্য বাসায়, কেননা আত্মা অমর।"

—রাল্ফ ওয়াল্ডো এমার্সন
'জার্নালস অফ রাল্ফ ওয়াল্ডো এমার্সন'

"আমার যখন জন্ম হয়েছিল তখন আমার শুরু হয় নি, যখন আমাকে ধারণ করা হয়েছিল, তখনও নয়। অসংখ্য অযুত সহস্র বৎসর ধরে আমি জন্মাচ্ছি, ক্রমবিকশিত হচ্ছি...আমার সকল পূর্ববর্তী 'আমার' কণ্ঠস্বর, প্রতিধ্বনি, আমার মধ্যে বিস্মৃতিকে জাগিয়ে তুলছে...ওহ্, আবার অগণিতবার আমাকে জন্ম নিতে হবে।"

—জ্যাক লন্ডন
'দ্য ষ্টার রোভার'

"মৃত্যু বলে কিছু নেই। যদি সবকিছু ভগবানের অংশই হয় তাহলে কিভাবে মৃত্যু থাকতে পারে? আত্মা কখনও মরে না আর দেহও প্রকৃতরূপে কখনও বেঁচে থাকে না।"

—আইজ্যাক বশেভিস সিঙ্গার
নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক
'স্টোরিজ ফ্রম বিহাইন্ড দ্য ষ্টোভ'

"এইসকল রূপ ও মুখকে সে সহস্র সম্পর্কতার মধ্যে...নতুন করে জন্ম নিতে দেখেছিল। প্রত্যেকেই ছিল মরণশীল, যা ক্ষণকাল স্থায়ী, তার

সকলই এক আবেগময়, ব্যাথার উদাহরণ। তবুও তাদের কেউই মরে নি, তারা কেবল পরিবর্তিত হয়েছিল, সর্বদা পুনর্জন্মিত, ক্রমাগত একেকটি নতুন মুখ; কেবল সময় একেকটি মুখের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল।

—হারম্যান হেস্,
নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক
'সিদ্ধার্থ'

"তোমার কি কোনও ধারণা আছে যে এই খাওয়া অথবা যুদ্ধ করা অথবা দলের ক্ষমতার চেয়েও জীবনে আরও কিছু আছে এবং এই ধারণাটির প্রথম অনুভবের আগে পর্যন্ত আমাদের কতটি জীবনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়? এক হাজার, জন, দশ হাজার। আর তারপরেও আরও একশত জীবন, যতক্ষণ না আমরা শিখতে শুরু করছি, এই ধরনের এক পূর্ণতা রয়েছে। তারপর আবার আরও একশত বৎসর এই ধারণাটি লাভ করতে যে সেই পূর্ণতা লাভ করা ও সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়াই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।"

—রিচার্ড বাখ
'জোনাথন লিভিংস্টোন সীগল'

"সহস্র স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আমরা যেমন আমাদের বর্তমান জীবনটি অতিবাহিত করি তেমনি আমাদের বর্তমান জীবনটিও এই ধরনের সহস্র জীবনের একটি, যেখানে আমরা প্রবেশ করি অন্য কারও বাস্তব জীবন থেকে...আর তারপর মৃত্যুর পর ফিরে যাই। আমাদের জীবনে ঐ আরও বাস্তব জীবনের স্বপ্নের মধ্যে একটি আর তা অন্তহীনভাবে চলতেই থাকে যতক্ষণ না সে ঐ শেষতম, ভগবৎ-জীবনের বাস্তবে পৌঁছয়।"

—কাউন্ট লিও টলস্টয়

উৎসর্গ

আমরা এই গ্রন্থটি আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব ও পথ-প্রদর্শক কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের করকমলে উৎসর্গ করছি, যিনি পুনর্জন্মের স্বীকৃত বিজ্ঞান সহ শ্রীকৃষ্ণে চিন্ময় শিক্ষাসমূহকে পাশ্চাত্য জগতে আনয়ন করেছিলেন। —সম্পাদকবর্গ

সমকালীন বৈদিক গ্রন্থাগারমালা

ভারতের অনাদিকালীন বৈদিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান আগ্রহের বিষয়বস্তুসমূহকে প্রকাশ করছে ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের এই সমকালীন বৈদিক গ্রন্থাগারমালার গ্রন্থগুলি।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) প্রতিষ্ঠাতা আচার্য (শ্রীগুরুদেব) কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, তত্ত্ববেত্তা গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বৈদিক সাহিত্যসমূহকে আধুনিক যুগের মানুষের কাছে উপস্থাপিত করার জন্য ১৯৭০ সনে এই 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট'এর প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইতিহাসে এই প্রথম, পৃথিবীর অত্যন্ত গভীর দার্শনিক ঐতিহ্য দ্রুত পাশ্চাত্যের ব্যাপক জনসাধারণের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে শুরু করে। পৃথিবী জুড়ে শতাধিক পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থরাজির আলোচনা করতে গিয়ে, অত্যন্ত গভীর এবং সূক্ষ্ম দার্শনিক বিষয়গুলিকে সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করার তাঁর দক্ষতা এবং মূল সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরোমৎকর্ষতার কথা স্বীকার করেছেন। *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* শ্রীল প্রভুপাদের বহুখণ্ডে পূর্ণ মূল সংস্কৃত হতে অনুবাদিত বিশাল গ্রন্থমালার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে "তাঁর সহজ ভাষা, বিশ্বের বিদ্বৎসমাজকে স্তম্ভিত করেছে।"

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বৈদিক জ্ঞান লক্ষ লক্ষ মানুষের আধ্যাত্মিক উৎসাহ, গভীর জ্ঞান ও অন্তস্থ শক্তির উৎসভূমি। সমকালীন বৈদিক গ্রন্থাগার সংস্করণসমূহ এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে এই একুশ শতকের অসংখ্য সমস্যার মুখোমুখি আধুনিক মানুষদের ক্ষেত্রে এই চিন্ময় জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের সময় সেটি যাতে মুল বিষয় হয়ে ওঠে।

সূচীপত্র

"জীবনের রহস্যের সন্ধান করতে গিয়ে আমি কেবল এটম ও ইলেকট্রনে পৌঁছেছি, যাদের মধ্যে মোটেও প্রাণের অবস্থিতি নেই। অবশেষে জীবন যেন আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে।"

—নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অ্যালবার্ট জেন্ট গীয়র্গী

ভূমিকা

অমরত্বের সন্ধানে

আমরা এমনভাবে ব্যবহার করছিলাম যেন আমরা চিরদিনের জন্য বেঁচে থাকবো, 'বিটলস্'-এর দিনগুলোতে প্রত্যেকেই এমন ভাবতো, তাই নয় কি? অর্থাৎ কে আর ভাবতো যে আমাদের মরে যেতে হবে?

—প্রাক্তন বিটল পল ম্যাকার্টনি

আপনি যদি আপনার অদৃষ্টের উপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই জন্মান্তর এবং কিভাবে সেটি ঘটে তা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এটি এমনই সহজ।

কেউই মরতে চান না। আমরা অধিকাংশ মানুষেরাই ভাঁজ পড়া ত্বক, ধূসর চুল কিম্বা বাতের ব্যথা বিনা পূর্ণ জীবনীশক্তি নিয়ে চিরদিন বেঁচে থাকতে চাই। সেটিই স্বাভাবিক, কেননা আমাদের জীবনের প্রথম ও মূল গুরুত্বপূর্ণ নীতিটিই হল উপভোগ করা। আহা, আমরা যদি কেবল চিরজীবন ধরে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারতাম!

অমরত্বের জন্য মানুষের চির অনুসন্ধিৎসা এতটাই মৌলিক বা অপরিহার্য যে মৃত্যুর ধারণা প্রায় অসম্ভব বলেই আমরা মনে করি। পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী লেখক উইলিয়াম সারোয়ানের *'দ্য হিউমান কমেডি'* গ্রন্থে মৃত্যু-পথ যাত্রী অধিকাংশ মানুষের এই ধারণা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। লেখক সংবাদ মাধ্যমকে বলেছিলেন, "প্রত্যেককেই মরে যেতে হবে, তবুও আমি সর্বদা বিশ্বাস করি, আমার ক্ষেত্রে বোধহয় এর ব্যতিক্রম হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হয়?"

আমরা অনেকেই বড় একটা মৃত্যু নিয়ে ভাবি না বা ভাবি না এরপর কি হবে। কেউ কেউ বলে মৃত্যুই সবকিছুর শেষ। কেউ

"পৃথিবীতে নিজেকে অবস্থান করতে দেখে আমি বিশ্বাস করছি যে আমি কোন না কোন রূপ নিয়ে সর্বদাই বর্ত্তমান থাকব।"

—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

মুখবন্ধ

চেতনার রহস্য

মৃত্যু। মানুষের পরম রহস্যময়, নিষ্ঠুর এবং অপ্রতিহত এক প্রতিপক্ষ। মৃত্যু মানেই কি জীবনের শেষ, অথবা তা আরেকটি জীবনের, আরেকটি আয়তনের বা আরেকটি পৃথিবীর দরজা খুলে দেয় মাত্র?

মৃত্যুর অভিজ্ঞতা যদি মানুষের চেতনায় রয়ে যায় তাহলে নতুন বাস্তবতায় রূপান্তরের নির্ধারকটি কি?

এই সব রহস্যগুলিকে স্বচ্ছভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ঐতিহ্যগতভাবে মানুষ উদ্দীপ্ত দার্শনিকদের শরণাপন্ন হয় এবং তাঁদের শিক্ষাকে পরম সত্যের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করে।

কতটা যত্নের সঙ্গে এই জিজ্ঞাসু বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে পারবে সেটি কোন ব্যাপার নয়, অথচ পরম তত্ত্ববেত্তার কাছে থেকে জ্ঞান অর্জনের এই পদ্ধাটিকে কেউ কেউ সমালোচনা করে। *'স্মল ইজ বিউটিফুল'* গ্রন্থের লেখক, সমাজ-দার্শনিক ই.এফ.শুমাখার লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের এই আধুনিক সমাজে মানুষেরা যখন ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংস্পর্শহীন, তারা "মনে করছে যে এগুলো হচ্ছে প্রথানুগ উপহাস এবং তারা কেবলমাত্র সেইটিই বিশ্বাস করে, যা তারা দেখে ও স্পর্শ করে ও পরিমাপ করে।" অথবা যেমন বলা হয়ে থাকে যে "দর্শনগ্রাহ্য বস্তুই বিশ্বাসযোগ্য।"

মানুষ যখন জড় ইন্দ্রিয়ের সুবিধার অতীত, পরিমাপনীয় যন্ত্র এবং মানসিক জল্পনা কল্পনার এক্তিয়ারের অতীত কোন কিছু হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে তখন জ্ঞানের কোন উচ্চতর উৎসের কাছে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না।

কোন বিজ্ঞানীই আজ পর্যন্ত গবেষণাগারে গবেষণার মাধ্যমে চেতনার রহস্য বা জড় দেহের বিনাশের পরে চেতনার কি গতি হয় তা সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এই বিষয়ের গবেষণা অনেক তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে বটে কিন্তু তাদের সীমাবদ্ধতাও অনস্বীকার্য। অপরদিকে জন্মান্তরের সুসম্বদ্ধ সূত্রগুলি আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের নিয়ামক সূক্ষ্ম নিয়মগুলিকে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করে।

কেউ যদি জন্মান্তরকে হৃদয়ঙ্গম করতে চায় তাকে অবশ্যই জড়দেহের উপাদানের চেয়ে ভিন্নতর ও পরম শক্তিরূপে চেতনার মূল ধারণাকে স্বীকার করতে হবে। মানুষের ইচ্ছাশক্তি, অনুভব শক্তি ও অনবদ্য চিন্তাশক্তির পরীক্ষা দ্বারা এই সূত্রটি সমর্থিত হয়। ডি এন এ কিম্বা প্রজনন শাস্ত্রের উপাদানসমূহ দ্বারা কি একজনের জন্য আরেক ব্যক্তির প্রেমানুভূতি ও শ্রদ্ধার আবিষ্টতা তৈরি করা যেতে পারে? পরমাণু অথবা আণবিক শক্তিসমূহ শেক্সপীয়ারের 'হ্যামলেট' বা বাখ'এর "মাস ইন বি মাইনর" এর সূক্ষ্ম নন্দনবোধের জন্য কতখানি দায়ী? কেবলমাত্র পরমাণু ও আণবিকতার দ্বারা মানুষ ও তাঁর সূক্ষ্ম সমর্থতাসমূহের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না। আধুনিক পদার্থবিদ্যার জনক আইনষ্টাইন স্বীকার করেছেন যে চেতনাকে কখনও পর্যাপ্তভাবে পদার্থীয় উপাদান দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। এই মহান বিজ্ঞানী একবার বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধতাকে মনুষ্য জীবনে প্রয়োগ করার বর্তমান প্রবণতা কেবল সামগ্রিকভাবে ভুলই নয়, সেইসঙ্গে তা কিছুটা নিন্দনীয়ও।"

নিঃসন্দেহে, বিজ্ঞানীরা তাদের আওতার মধ্যস্থ সমস্তকিছুর পরিচালনকারী পদার্থের নিয়মসমূহ দ্বারা চেতনাকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে চিকিৎসা ও শরীরবিদ্যায় নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী Albert Szent Gyorgyi সম্প্রতি বিলাপ করেছেন, "জীবনের রহস্যের সন্ধান করতে গিয়ে আমি কেবল এটম

ও ইলেকট্রনে পৌঁছেছি, যাদের মধ্যে মোটেও প্রাণের অবস্থিতি নেই। অবশেষে জীবন যেন আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই আমার বৃদ্ধ বয়সে, এখন আমি আবার উৎসের দিকে ফিরে চলেছি।"

আণবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে চেতনার উদ্ভব হয়েছে, এই ধারণা গ্রহণ করার জন্য চাই অধিবিদ্যাগত ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয় বিশ্বাসের চাইতেও এক প্রচণ্ড বিশ্বাস। সুপরিচিত জীব-বিজ্ঞানী টমাস হাক্সলী বলেছেন, "এটি আমার কাছে যেন এক স্পষ্ট উদ্ভাবন যে ব্রহ্মাণ্ডে একটি তৃতীয় বস্তু রয়েছে, চেতনা, যা আমি বস্তু বা শক্তি অথবা এই দুটির কোন কল্পনাসাধ্য পরিবর্তিত রূপ বা আকারগতভাবে দর্শন করতে পারি না।"

চেতনার অনবদ্য বৈশিষ্ট্যের আরও স্বীকৃতি প্রদত্ত হয়েছে নোবেলজয়ী পদার্থবিদ্ নীল বোর দ্বারা যিনি বলছেন "আমরা স্বীকার করছি যে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার কোন ক্ষেত্রের গভীরেও চেতনার কোন কিছুই আমরা খুঁজে পাইনি। যদিও আমরা সকলে জানি যে চেতনা বলে একটি বস্তু রয়েছে এবং সেটি এই কারণেই যে তা আমাদের মধ্যে রয়েছে। অতএব চেতনা অবশ্যই প্রকৃতির একটি অঙ্গ বা আরও সরলভাবে বলতে গেলে বাস্তবতার একটি অংশ, যার অর্থ হচ্ছে কোয়ান্টাম তত্ত্বে নিহিত পদার্থ ও রসায়ণের বিধি ব্যতীতও আমাদের অবশ্যই অন্য ধরনের এক বিধিরও বিবেচনা করা উচিত।" এই বিধি অবশ্যই জন্মান্তরের বিধির সঙ্গে বিজড়িত যা চেতনাকে এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তরিত হওয়ার চেতনার পথকে শাসিত করে।

এই বিধি হৃদয়ঙ্গম করার শুরুতে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে জন্মান্তর কোন অস্বভাবী বা বিপরীত পৃথিবীপৃষ্ঠ সংক্রান্ত ব্যাপার নয়, বরং তা নিয়মিতভাবে এই জীবনেই আমাদের নিজস্ব দেহগুলিতে

ঘটে চলেছে। 'হিউম্যান ব্রেন' নামক গ্রন্থে অধ্যাপক জন ফেইফার উল্লেখ করেছেন "যে অণু-কণা আপনার দেহে সাত বৎসর আগে ছিল সেই অণু-কণার একটিও এখন আর আপনার দেহে নেই।" প্রতি সাত বৎসর অন্তর অন্তর দেহের কোষ মধ্যস্থ পদার্থ সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হওয়ায় পুরানো দেহটি অধিকতর সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু আত্মা বা আমাদের প্রকৃত পরিচিতি অপরিবর্তিত থাকে। শিশুকাল থেকে ক্রমে যৌবনে, তারপর মধ্য বয়স্কতায় এবং তারও পরে বৃদ্ধ বয়সে আমাদের দেহটি বর্দ্ধিত হতে থাকে, যদিও দেহাভ্যন্তরস্থ 'আমি' সত্বাটি সর্বদা একই থাকে

জন্মান্তরবাদ বা পুনরায় দেহধারণ—দেহের আত্মা-স্বতন্ত্র সচেতনতার সূত্র নির্ভর একটি ঘটনা, যা জীবের এক দেহরূপ থেকে আরেক দেহরূপে রূপান্তরিত হবার উচ্চতম পন্থার একটি অংশ। যেহেতু জন্মান্তর বা পুনরায় দেহধারণ ব্যাপারটি আমাদের আপন আত্মা বিষয়ক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ব্যাপার তাই এটি প্রত্যেকের জন্যই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবপদার্থবিদ ডি পি ডুপে লিখছেন, "প্রকৃতির আইন বলতে আমরা যা জানি তার দ্বারা জীবনকে সামগ্রিকভাবে বর্ণনা করা যাবে এই অন্ধ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা হয়ত নিজেদেরকে অন্ধ-বিশ্বাসের কানাগলিতে প্রবেশ করাতে পারি। কিন্তু ভারতের বৈদিক ঐতিহ্যের জ্ঞানকে উন্মুক্ত করলে আধুনিক বিজ্ঞানীরা দেখতে পারবে যে তাদের নিজস্ব বিষয়কেই এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে, যা সকল বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টারই উদ্দেশ্য- সত্যের অনুসন্ধান।"

বিশ্বময় অনিশ্চয়তার এই যুগে, আমাদের চেতন আত্মার মূল উৎসকে কিভাবে আমরা আমাদের বিভিন্ন দেহে ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় প্রাপ্ত হই এবং মৃত্যুর সময় আমাদের গতি কি, সেটি হৃদয়ঙ্গম

করা অত্যন্ত প্রয়োজন এই *'পুনরাগমন'* গ্রন্থটিতে সেই প্রয়োজনীয় তথ্য বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শন করা হয়েছে যে কিভাবে সক্রেটিস থেকে সেলিংগার পর্যন্ত পৃথিবীর বহু বড় বড় দার্শনিক, কবি ও শিল্পীকে জন্মান্তরবাদ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে এরপর, আত্মার দেহান্তর বিষয়ে অত্যন্ত প্রাচীন ও অত্যন্ত শ্রদ্ধার উৎসগ্রন্থ *ভগবদ্গীতায়* ব্যাখ্যাত জন্মান্তরবাদ বা পুনরায় দেহধারণের পন্থাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ও প্রখ্যাত ধর্মীয় মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপক কার্লফ্রেইড গ্রাফ্ ভন দুর্কহেইমের মাঝে এক প্রাণবন্ত কথোপকথনের মাধ্যে পরিষ্কারভাবে প্রদর্শিত হয়েছে যে কিভাবে জড় দেহ এবং জড়বিপরীত কণা, আত্মা, কখনও এক হতে পারে না তৃতীয় অধ্যায়ে প্রখ্যাত হার্ট সার্জন আত্মা বিষয়ে সুশৃঙ্খল গবেষণার প্রয়োজন দাবী করলে পর শ্রীল প্রভুপাদ বৈদিক জ্ঞানভাণ্ডারের উল্লেখ করে বলেন সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেকার এই জ্ঞান এখনও বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের চেয়েও আরও অধিক উন্নত তথ্য প্রদান করছে বৈদিক গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে এইরকম তথ্যমূলক তিনটি চমৎকার উদাহরণ দিয়ে চতুর্থ অধ্যায়টি গঠিত হয়েছে কর্ম ও প্রকৃতির মূল্যবান বিধানের নিয়ন্ত্রণাধীনে কিভাবে আত্মা এক দেহ থেকে আরেক ধরনের দেহে দেহান্তরিত হয় সেখানে সে কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে যে কিভাবে আমাদের জীবনে দৈনন্দিন ঘটা সাধারণ ঘটনা এবং সাধারণ পর্যবেক্ষনের পরিপ্রেক্ষিতে জন্মান্তরের সূত্রসমূহকে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে জন্মান্তরের পন্থা সর্বজনীন ও অভ্রান্ত

বিচারকে রূপদান করছে, যার মাধ্যমে অবিনাশী আত্মা জন্মমৃত্যুর নিত্যকালের চক্র থেকে অবশেষে উদ্ধার পাবার সুযোগ লাভ করে

জন্মান্তর সম্বন্ধে সাধারণ ভুল ধারণা এবং সঠিক ধারণাগুলো নিয়ে গঠিত হয়েছে সপ্তম অধ্যায়টি। শেষ অধ্যায় 'আবার ফিরে এসো না' উপস্থাপন করছে সেই পন্থাটি, যার মাধ্যমে আত্মা জন্মান্তরকে অতিক্রম করে সেই রাজ্যে প্রবেশ করে যেখান থেকে সে শেষপর্যন্ত এই জড় দেহরূপ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে যায় এই অবস্থা একবার অর্জিত হলে আত্মাকে আর কখনও এই পরিবর্তনশীল, অনিঃশেষ জন্ম, মৃত্যু, জড়া ও ব্যাধির জগতে ফিরে আসতে হয় না।

১

পুনর্জন্ম : সক্রেটিস থেকে সেলিংগার

আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন হলেও চিরনবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না। —ভগবদ্গীতা ২/২০

জীবনটা কি কেবল জন্ম দিয়ে শুরু হয় আর মৃত্যু দিয়ে শেষ হয়? আমরা কি আগে কখনও জীবন ধারণ করেছিলাম? এই ধরনের প্রশ্নগুলি সাধারণত প্রাচ্যের ধর্মভাবনাগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে এইসব দেশে মানুষের জীবনধারা শুধুমাত্র মাতৃক্রোড় থেকে মৃত্যুর সমাধি পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে—এমনটা মনে করা হয় না। বরং মনে করা হয় যে লক্ষ-কোটি যুগ ব্যাপি এই জীবনধারা সম্প্রসারিত এইসব দেশে পুনর্জন্মের ভাবধারা প্রায় সর্বত্রই গ্রাহ্য যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর মহান জার্মান দার্শনিক আর্থার সোপেনহাওয়ার একবার তার উপলব্ধি সম্বন্ধে বলেছিলেন—"যদি কোন এশিয়াবাসি ইউরোপের সংজ্ঞা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমাকে তাঁর উত্তরে বলতে হবে—এটা পৃথিবীর সেই অংশ যেখানে অবিশ্বাস্য বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে সকলে মনে করে যে মানুষ শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং এই বর্তমান জন্মটিতেই জীবনক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ।"[১]

অবশ্য, গত কয়েক শতাব্দী ধরে, পাশ্চাত্যের প্রধান ভাবধারা জড় জাগতিক বিজ্ঞানে, বর্তমান দেহসত্তার বাইরে কোন অস্তিত্বের এবং

চেতন সত্তার সম্বন্ধীয় ব্যাপক আগ্রহের বিরোধিতা করা হয়ে এসেছে কিন্তু পাশ্চাত্যের ইতিহাসে যেসব চিন্তাশীল মানুষরা এই বিষয়টি নিয়ে প্রতিনিয়ত ভেবেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা চেতন সত্তার অমরত্ব এবং আত্মার দেহান্তর তত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। সেই সাথে অনেক দার্শনিক, গ্রন্থকার, শিল্পী, বিজ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদেরাও এই ভাবধারার প্রতি তাদের সুচিন্তিত মনোযোগ অভিনিবেশ করেছেন।

প্রাচীন গ্রীস

প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে সক্রেটিস, পিথাগোরাস এবং প্লেটো তাদের শিক্ষাধারার অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে পুনর্জন্মের উল্লেখ করেছেন বলা যেতে পারে। সক্রেটিস তাঁর জীবন সায়াহ্নে বলেছিলেন, "আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে আবার জন্মগ্রহণ করার মতন একটি ব্যাপার অবশ্যই আছে এবং মৃত্যু থেকেই জীবন উত্থিত হয়ে থাকে।"[২] পিথাগোরাস দাবী করেছিলেন যে নিজের পূর্বজীবনের কথা তিনি স্মরণ করতে পারেন। প্লেটো তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীতে পুনর্জন্মের বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন সংক্ষেপে বলা যায় যে, তিনি বিশ্বাস করতেন, শুদ্ধ আত্মা পরম তত্ত্বের স্তর থেকে অধঃপতিত হয় তার জড়জাগতিক অভিলাষের জন্য। তখন সে একটি শরীর ও রূপ গ্রহণ করে সর্বপ্রথম অধঃপতিত আত্মা মানব রূপ ধারণ করে, যার মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হল দার্শনিক যিনি উচ্চতর জ্ঞান অনুসন্ধান করেন যদি তাঁর জ্ঞান আহরণ সার্থক হয় তবে সেই দার্শনিক এক অনন্ত অস্তিত্বের জগতে ফিরে যেতে পারেন তবে যদি তিনি জড় জাগতিক কামনা বাসনার মধ্যে দুর্ভাগ্যবশত আটকে পড়েন, তবে পরবর্তী জন্মে তিনি নিম্নতর পশু যোনীতে জন্ম নেন। প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে মদ্যপ মানুষ পরবর্তী জন্মে গাধা হতে পারে, হিংস্র, দুরাচারী মানুষরা শেয়াল,

কুকুর রূপে জন্ম নিতে পারে, সমাজের প্রচলিত ধারার অন্ধ অনুগামী মানুষরা মৌমাছি বা পিঁপড়ে হয়ে জন্মাতে পারে কিছু দিন পরে আত্মা আবার মানবরূপ লাভ করে এবং মুক্তির আরও একটা সুযোগ পায়।[৩] কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন প্লেটো এবং অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকরা পুনর্জন্ম সম্পর্কে তাদের এই জ্ঞান অরফিজম ধর্মতত্ত্বের মতন রহস্যবাদ অথবা ভারতবর্ষ থেকে আহরণ করেছেন

ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম

ইহুদি ও প্রাচীন ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসেও পুনর্জন্মবাদের ইঙ্গিত প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় হিব্রু পণ্ডিতদের মতানুসারে কাবালা গ্রন্থের সর্বত্রই অতীত ও ভবিষ্যত জীবনের তত্ত্বকথা দেখা যায় বহু হিব্রু পণ্ডিতদের মতে এগুলি হল শাস্ত্রের মধ্যস্থ গুপ্ত জ্ঞানসম্ভার মুখ্য কাবালা গ্রন্থের অন্যতম জোহারে বলা হয়েছে "আত্মা যেখান থেকে উদ্ভূত হয়েছে সেই পরম তত্ত্বে তাকে অবশ্যই পুনঃপ্রবেশ করতে হয়। তবে তা সম্পন্ন করতে হলে তাদের (আত্মা) সকল প্রকাশ শুদ্ধতা বিকশিত করতে হয়। এই শুদ্ধতার বীজ তাদের অভ্যন্তরেই নিহিত থাকে, এবং যদি তারা ইহ জীবনে এই শর্ত পরিপূরণ না করে, তবে তাদের অবশ্যই অন্য আরেকটি বা তৃতীয় একটি বা চতুর্থ একটি এইভাবে আরও অনেক জীবন অতিবাহিত করতে হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা শ্রীভগবানের সাথে পুনর্মিলিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারে।"[৪] 'ইউনিভার্সাল জীবস্ এনসাইক্লোপিডিয়া' অনুসারে হাসিডিক (Hasidic) ইহুদীরাও একই ধরনের বিশ্বাস পোষণ করে।[৫]

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে, গীর্জার পুরোহিত সম্প্রদায়ের অন্যতম, ধর্মতাত্ত্বিক অরিজেন ছিলেন বাইবেলের একজন প্রথিতযশা সুপণ্ডিত। তিনি লিখেছিলেন "কিছু মন্দ ক্রিয়াকর্মের অভিলাষে কোন কোন

জীবাত্মা শরীর রূপ লাভ করে, প্রথমে মানুষ, তারপর অযৌক্তিক কামনা বাসনার সঙ্গে জড়িত হওয়ার জন্য নির্ধারিত মানবজীবন লাভ করার পর তারা পশুতে পরিবর্তিত হয়, সেখান থেকে তারা বৃক্ষলতার পর্যায়ে অধঃপতিত হয় এই অবস্থা থেকে কতগুলি পর্যায়ের মাধ্যমে তারা আবার উত্থান লাভ করে এবং তাদের স্বর্গীয় মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।"[৬]

বাইবেলের মধ্যেই অনেক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে যীশুখ্রীষ্ট এবং তাঁর অনুগামীরা পুনর্জন্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন একবার যিশুকে শিষ্যরা ওল্ড টেস্টামেন্টের ভবিষ্যতবাণী যে ইলিয়াসকে আবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে হবে—এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল সেন্ট ম্যাথিউ'র উপদেশাবলীতে রয়েছে, "যিশু তাদের উত্তর দিলেন, ইলিয়াস অবশ্যই প্রথমে আসবে এবং সব কিছু ফিরে পাবে কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যে, ইলিয়াস ইতিমধ্যেই এসে গেছে এবং তারা তাকে জানে না, তখন শিষ্যবর্গ বুঝতে পারলেন যে তিনি জন ব্যাপটিস্টের কথা তাদেরকে বলছেন।"[৭] প্রকারান্তরে যীশু ঘোষণা করেছিলেন যে জন ব্যাপটিস্ট, হীরদো যার মস্তক ছিন্ন করেছিল, সেই-ই ইলিয়াসের পুনর্জন্ম লাভ করেছিল আর একটি ঘটনায় যীশু এবং তাঁর শিশুরা এক জন্মান্ধ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন। শিষ্যরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কে পাপ করেছিল, এই মানুষটি নাকি তাঁর পিতা মাতারা, যাতে সে জন্মান্ধ হয়েছে?"[৮] কে পাপ করেছিল তার উল্লেখ না করেই যীশু উত্তর দিয়েছিলেন, ভগবানের ক্রিয়াপদ্ধতি প্রদর্শনের এই একটি পদ্ধতি যিশু তখন জন্মান্ধ ব্যক্তিটিকে আরোগ্য করেছিলেন এখানে পরিষ্কার বোঝা যায় যে লোকটি যদি তার নিজের পাপে জন্মান্ধ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তার জন্মের পূর্বে সে পাপ করেছিল অর্থাৎ সেটি পূর্বজন্মের কর্মফল এথেকেই বোঝা গিয়েছিল যে যীশু জন্মান্তর তত্ত্বের বিরোধিতা করেন নি।

কোরাণ বলেছে, "আর তোমার মৃত্যু হয়েছিল এবং তিনি তোমাকে পুনর্জন্ম দিয়েছেন, আর তিনি তোমার মৃত্যুর কারণ হবেন এবং তোমাকে পুনর্জন্মে ফিরিয়ে আনবেন এবং অবশেষে তোমাকে তার নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করে নেবেন।"[৯] ইসলামের অনুগামীদের মধ্যে, সুফী সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষভাবে বিশ্বাস করে যে মৃত্যু কোন লোকসান নয়, কারণ অমর আত্মা অবিরামভাবে বিভিন্ন শরীর রূপের মধ্য দিয়ে চলমান থাকে বিখ্যাত সুফি কবি জালালউদ্দিন রুমি লিখেছেন—

"আমি মরেছিলাম খনিজ হয়ে, আর ফিরে এলাম গাছ হয়ে
আমি মরেছিলাম গাছ হয়ে, আর জেগে উঠলাম প্রাণী হয়ে
আমি মরেছিলাম প্রাণী হয়ে, আর হয়েছিলাম মানুষ,
আমি করব কেন ভয়? মরণের মাঝে আমার কতটুকু ক্ষয়?"[১০]

ভারতের সুপ্রাচীন বৈদিক শাস্ত্র সম্ভারে উল্লেখ করা হয়েছে যে আত্মা জড় জাগতিক প্রকৃতি অনুসারে ৮৪ ০০,০০০ রূপের কোন একটি ধারণ করে একসময় একটি বিশেষ প্রজাতির শরীর ধারণ করে এবং তারপর থেকে ক্রমশ একের পর এক উচ্চতর রূপ লাভ করতে করতে অবশেষে মানবরূপ ধারণ করে

এইভাবে ইহুদি, খ্রীষ্টান ও ইসলাম—সমস্ত পাশ্চাত্য ধর্মই তাদের শিক্ষাধারার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পুনর্জন্ম তত্ত্বের কথা বলেছে। যদিও ধর্মনেতাগণ বদ্ধ ধারণার বশে সেগুলি অবহেলা করে, অগ্রাহ্য করে

মধ্যযুগ ও নবজাগরণ

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫৩ সালে (A D) বাইজেন্টাইন সম্রাট জাসটেনিয়ান রোমান ক্যাথলিক গীর্জা থেকে আত্মার পূর্বজন্মের তত্ত্ব চর্চা কেন নিষিদ্ধ করেছিলেন তা আজও রহস্য. সেই যুগে গীর্জার বহু লেখা নষ্ট করা

হয়েছিল বিশেষত পুনর্জন্ম তত্ত্ব সম্পর্কিত তত্ত্ব কথাগুলি শাস্ত্রাদি থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল তবে বিভিন্ন উপসম্প্রদায়গুলি গীর্জার অনুশাসনে কঠোরভাবে অবদমিত হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দেশগুলোতে পুনর্জন্ম তত্ত্ব সজীব ছিল

নবজাগরণের যুগে জনগণের মধ্যে পুনর্জন্ম তত্ত্বের আগ্রহ পুনরায় জেগে উঠেছিল। এই নবজাগরণের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন ইতালির নেতা দার্শনিক ও কবি গিয়র্দানো ব্রুনো তাকে বিচারের নামে জীবন্ত দগ্ধ করার শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কারণ তিনি পুনর্জন্মের কথা বলেছিলেন। তার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত দোষারোপের শেষ উত্তরে ব্রুনো দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন "আত্মা শরীর নয়, এই আত্মা কোন একটি শরীরে থাকতে পারে এবং দেহ থেকে দেহান্তরে চলে যেতে পারে।"[১১]

গীর্জার এই ধরনের দমননীতির জন্য পুনর্জন্ম তত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তাধারা তখন গুপ্ত তত্ত্বরূপে হারিয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র ইউরোপের রোসিক্রুসিয়ান, ফ্রিম্যাশান, ক্যাবালিস্ট সহ কিছু সম্মিলনের মধ্যে তা প্রচলিত ছিল।

জ্ঞানালোক সঞ্চারের যুগ

জ্ঞান সঞ্চারের যুগে ইউরোপের বুদ্ধিজীবিরা গীর্জার এই নিষিদ্ধকরণ নীতির বিরোধিতা করেন মহান দার্শনিক ভলতেয়ার লিখেছিলেন যে পুনর্জন্ম তত্ত্ব "অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় নয়" সেইসাথে এও লিখেছিলেন "একবারের বেশী দুবার জন্ম নেওয়া তেমন আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়।"[১২]

অবশ্য লক্ষ্য করা যায় যে আমেরিকার বহু শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত পুনর্জন্মবাদ নিয়ে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন তারা শেষ পর্যন্ত পুনর্জন্ম-তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এর ফলে এই বিষয়টি আটলান্টিক পাড় হয়ে আমেরিকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল বেঞ্জামিন

ফ্রাংকলিন তার দৃঢ় বিশ্বাস অভিব্যক্ত করে লেখেন "পৃথিবীতে নিজেকে অবস্থান করতে দেখে আমি বিশ্বাস করছি যে আমি কোন না কোন রূপ নিয়ে সর্বদাই বর্তমান থাকব।"[১৩]

১৮১৪ খ্রীঃ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন আডামস্ হিন্দু সম্পর্কিত গ্রন্থ পড়ার সময় অন্য এক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি থমাস জেফারসনকে পুনর্জন্মের তত্ত্ব নিয়ে লিখেছিলেন। আডামস্ লিখেছিলেন "পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার পরে কোন কোন জীবাত্মাকে পরিপূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে নিক্ষেপ করা হয়েছে" সেই কূটনীতিজ্ঞ আরও বলেন "তারপর তাদের কারাগার থেকে মুক্ত করে পৃথিবীতে নেমে এসে তাদের স্তর ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে সরীসৃপ, পক্ষী, পশু, মনুষ্য, এমনকি বৃক্ষ লতা গুল্মাদি ও খনিজরূপ ইত্যাদি সকল প্রকার জীবরূপে ভ্রমণ করে সংশোধনকারীন কাজ করতে হয়। তারা যদি ভালোভাবে বা ভর্ৎসনাহীনভাবে তাদের এই ধাপে ধাপে উন্নতির স্তর অতিক্রম করতে পারে তখন তাদের গাভী অথবা মানুষ হওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয় যদি তারা মানুষরূপে ভালো ব্যবহার করে তাদের তখন তাদের মূল স্বর্গ-সুখের পদে ফিরিয়ে নেওয়া হয়"[১৪]

ইউরোপে নেপোলিয়ান তাঁর সেনাধ্যক্ষদের বলতেন যে পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন শার্লেমান।[১৫] জোহান উল্‌ফগ্যাঙ ভন গথে জার্মান কবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পুনর্জন্ম আছে। সম্ভবত ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব চর্চার মাধ্যমে তিনি এই তত্ত্বের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন নাট্যকার ও বিজ্ঞানী হিসেবে প্রসিদ্ধ গথে একবার মন্তব্য করেছিলেন "আমি সুনিশ্চিত যে পূর্বে আমি যেভাবে হাজার হাজার বার এখানে এসেছিলাম তেমনই এবার এসেছি এবং আমি আশা করি ভবিষ্যতেও হাজার হাজার বার ফিরে আসব।[১৬]

অতীন্দ্রিয়বাদ

ইমারসন, হুইটম্যান, থরো প্রমুখ আমেরিকান অতীন্দ্রিয়বাদীদের মধ্যে পুনর্জন্ম ও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহ রয়েছে। ইমারসন লিখেছিলেন "জগতের এক রহস্য যে সব জিনিষ বিলীন হয় কিন্তু মরে না। শুধু কিছু সময় দৃশ্য বহির্ভূত হয় ও পরে আবার ফিরে আসে. কোন কিছুই মরে না। মানুষ মৃতের মতন মূর্ছিত হয়ে থাকে ও সাজান শেষকৃত্য ও দুঃখ শোক সহ্য করে।"[১৭] ইমারসন তাঁর গ্রন্থাগারে রাখা প্রাচীন ভারতীয় দর্শন তত্ত্বের বহুবিধ গ্রন্থাবলীর অন্যতম কঠউপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলেন, "আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, কোন কিছু থেকে তার সৃষ্টি হয় না, এই শরীর নাশ হলেও আত্মার নাশ হয় না।"[১৮]

'ওয়াল্ডেন পণ্ড' খ্যাত দার্শনিক থরো লিখেছিলেন, 'যতদূর সম্ভব অতীতের কথা আমি মনে করতে পারি তা হল অবচেতনভাবে আমার অস্তিত্বের এক অতীত অবস্থানের অভিজ্ঞতা যেন আমি অনুভব করি।"[১৯] পুনর্জন্ম তত্ত্ব সম্পর্কে দার্শনিক থরোর গভীর আগ্রহ ১৯২৬ সালে একটি পাণ্ডুলিপি উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। পাণ্ডুলিপিটির নাম "সাত ব্রাহ্মণের পুনর্জন্ম"। প্রাচীন সংস্কৃত ইতিহাস থেকে পুনর্জন্ম সম্পর্কিত একটি কাহিনীর অনুবাদ এই গ্রন্থটি। এখানে পুনর্জন্মের কাহিনী ৭ জন ঋষির জীবনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল। যারা বিভিন্ন জন্মসূত্রে কখনও শিকারী, কখনও রাজপুত্র আবার কখনও পশুরূপে জন্মেছিল।

ওয়াল্ট হুইটম্যান তার কবিতা "Song of Myself"-এ লিখেছিলেন,

"আমি জানি আমি মৃত্যুহীন...
আমরা এইভাবে জীবন কাটিয়েছি

লক্ষ কোটি শীত ও গ্রীষ্মের মধ্য দিয়ে
সামনে রয়েছে আরও
লক্ষ কোটি বছর।"[২০]

ফ্রান্সের সুখ্যাত গ্রন্থকার হনোর বালজাক পুনর্জন্ম তত্ত্ব নিয়ে একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সেরাফিতা' লিখেছিলেন। সেখানে বালজাক বলেছেন, "সমস্ত মানুষ একটা পূর্বজন্মের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে আসে...কে জানে কতগুলি রূপ নিয়ে তাদের স্বর্গবাসী পূর্বপুরুষেরা জগতে আসেন যাতে গ্রহ নক্ষত্রময় মহাশূন্যের নিস্তব্ধতা ও জনশূন্যতার মূল্য উপলব্ধি করা যায় আধ্যাত্মিক জগতের শোভাযাত্রার মাঝে।"[২১]

চার্লস ডিকেন্স তাঁর *ডেভিড কপারফিল্ড* উপন্যাসে এমন এক অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন যেখানে অতীত জীবনের স্মৃতিচারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "আমাদের সকলেরই এক অনুভূতির কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা ঘটনাচক্রে আমাদের মধ্যে আগমিত হয়। তখন আমরা যা বলি এবং করি তা যেন এক সুদূর সময়ের বলা আর করা—আমরা একই মুখ, একই বিষয় এবং একই ঘটনার দ্বারা এক অস্পষ্ট অতীতে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকি।"[২২]

রাশিয়াতে, স্বনামধন্য লিও টলস্টয় লিখেছিলেন, "আমরা যেমন আমাদের ইহজীবনে হাজার হাজার স্বপ্নের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করি তেমনি আমাদের বর্তমান জীবনটি বহু সহস্র ঐ ধরনের জীবনের অন্যতম, যেগুলির একটি থেকে অন্যটিতে আমরা অনুপ্রবেশ করছি, মৃত্যু শেষে আবার ফিরে যাচ্ছি। আমাদের জীবনটি নিতান্তই সেই অধিকতর নিত্য জীবনের অন্যতম।"[২৩]

আধুনিক যুগ

বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করে আমরা দেখি পাশ্চাত্যের অতীব প্রভাবশালী শিল্পীদের অন্যতম পল গঁগ্যাঁ পুনর্জন্মের প্রতি আকৃষ্ট

হয়েছিলেন তিনি তাঁর জীবনের অন্তিম বছরগুলোতে তাহিতি দ্বীপে কাটিয়েছিলেন। সেখানে বসে তিনি লিখেছিলেন শরীরের ক্রিয়াকলাপ ভগ্ন হলেও 'আত্মা বেঁচে থাকে। তখন সে অন্য দেহ গ্রহণ করে' গাঁগ লিখেছিলেন, "সৎকর্ম বা অপকর্ম অনুসারে আত্মার অবস্থান তখন উন্নীত বা অবনত হয়।" এই শিল্পী বিশ্বাস করতেন যে পাশ্চাত্যে প্রবাহমান পুর্নজন্মের ভাবধারা প্রচার করেছিলেন পীথাগোরাস। তিনি প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের কাছ থেকে এই তত্ত্ব শিখেছিলেন [২৪]

মার্কিন শিল্পপতি হেনরি ফোর্ড একবার একটি সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "ছাব্বিশ বছর বয়সে আমি পুর্নজন্মের তত্ত্ব গ্রহণ করেছিলাম।" ফোর্ড বলেন, "প্রতিভা (Genius) একটি অভিজ্ঞতা। আমার মনে হয় অনেকে ভাবেন এটি একটি উপহার বা ক্ষমতা (talent), কিন্তু এটি বহু জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সুফল।"[২৫] ঠিক এভাবেই মার্কিন সেনাধ্যক্ষ জর্জ প্যাটন বিশ্বাস করতেন যে তাঁর সামরিক নৈপুণ্যের সবকিছুই তিনি প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্রগুলি থেকে আহরণ করেছেন।

আইরিশ ঔপন্যাসিক জেমস জয়েসের ইউলিসিস গ্রন্থে পুনর্জন্মের তত্ত্ব বারে বারে উল্লিখিত হয়েছে এই উপন্যাসের বিখ্যাত অনুচ্ছেদগুলির একটিতে জয়েসের বর্ণিত একটি চরিত্র মি. ব্লুম তার স্ত্রীকে বলছেন, "কিছু লোক বিশ্বাস করে আমরা পূর্বেও জীবনধারণ করেছিলাম। তারা এটাকে পুনর্জন্ম বলে। আমরা নাকি পৃথিবীতে হাজার হাজার বছর আগে বা অন্য গ্রহতেও এর আগে বাস করতাম তারা বলে যে আমরা এটা ভুলে গিয়েছি কেউবা বলে তারা তাদের পূর্বজন্মের কথা মনে করতে পারে।"[২৬]

জ্যাক লন্ডন তার লেখা দ্য স্টার রোভার উপন্যাসে পুনর্জন্মবাদকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় করেছিলেন যেখানে মূল চরিত্রটি বলছে, "আমি যখন জন্মেছিলাম তখন আমার জীবন শুরু হয়নি। আমি গড়ে উঠছি,

বিকশিত হচ্ছি যুগযুগান্ত ধরে আমার সমস্ত পূর্ব সত্তার কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনি সব আমার মধ্যে নেপথ্যচারী হয়ে আছে অসংখ্য বার আবার আমি জন্ম নেব, তবুও নির্বোধেরা ভাবে আমার গলায় দড়ি দিয়ে আমাকে শেষ করে ফেলবে।"[২৭]

নোবেল বিজয়ী হারমান সিদ্ধার্থ তার লেখা আধ্যাত্মিক সত্যানুসন্ধান সম্পর্কিত বহুপঠিত উপন্যাসে লিখেছিলেন "এই সব রূপ ও মুখচ্ছবি হাজারে হাজার সম্পর্ক সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি দেখেছিলেন তারা কেউ মরেনি, ক্রমাগত নতুন রূপ নিয়েছে শুধুমাত্র মহাকাল তাদের একমুখ ও অন্যমুখের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে"[২৮]

অগণিত বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরাও পুনর্জন্ম তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়েছেন আধুনিক প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানীদের অন্যতম কার্ল ইউং অনন্ত আত্মসত্তা যেভাবে বহু জন্ম জন্মান্তরের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আত্মা এবং চেতন সত্তার গভীরতম রহস্য বোঝবার চেষ্টা করেছেন " আমি বেশ ধারণা করতে পারি যে আগের শতাব্দীগুলোতে আমি জীবনধারণ করে থাকতে পারি ও বহু প্রশ্নাবলীর সম্মুখীন হয়েও আমি তাদের উত্তর দিতে পারিনি, তাই আমাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছে যাতে আমার প্রতি আরব্ধ অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে পারি।"[২৯]

ব্রিটিশ জীব বিজ্ঞানী থমাস হাক্সলে লক্ষ্য করেছিলেন যে পুনর্জন্মের তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনের মহাবিশ্বের পথে সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠা লাভের পথে একটি উপায় মাত্র। তিনি তাই সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে হঠকারি চিন্তাবিদেরা অবাস্তব তত্ত্বের যুক্তি দিয়ে এই তত্ত্ব ন্যাস্য করবে "[৩০]

মনোসমীক্ষণ ও মানবিক বিকাশের ক্ষেত্রে আমেরিকার এক বিশিষ্ট মনোসমীক্ষণবিৎ এরিক এরিকসন দৃঢভাবে বলেছিলেন যে পুনর্জন্ম বিষয়টি প্রত্যেক মানুষের বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল অবধি বিস্তৃত হয়েছে

উনি লিখেছিলেন, 'আমাদের এর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।' কোন ব্যক্তি তার সজাগ মনে এটা দেখতে পায় না যে সে সদাসর্বদা বেঁচে ছিল এবং সদাসর্বদা বেঁচে থাকবে।'[৩১]

আধুনিক যুগের মহান রাজনীতিবিদ এবং অহিংসার প্রচারক মহাত্মা গান্ধী একবার বলেছিলেন যে পুনর্জন্মের বাস্তবিক উপলব্ধি কিভাবে তাকে বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আশা জুগিয়েছিল গান্ধি বলেছিলেন, "আমি মানুষে মানুষে স্থায়ী শত্রুতার কথা ভাবতে পারি না এবং মানুষের পুনর্জন্মে বিশ্বাস রাখি, আমি এই আশা নিয়েই বেঁচে আছি যে যদি এই জন্মে না হয় তাহলে অন্য কোন জন্মে আমি সকল মানবজাতির মধ্যে মৈত্রীর আলিঙ্গন স্থাপন করতে পারব।'[৩২]

জে ডি সেলিংগার তাঁর একটি বিখ্যাত ছোট গল্পে টেডি নামের একটি ছোট ছেলের কথা বলেছিলেন যে কিনা ছোট বয়সেই অনেকটা পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটি তার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারত এবং সে সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে সবকিছু বলত। ''এটা বোকামি। ব্যাপারটা হল শুধু এই যে যখন আপনি মরে যান তখন শুধু নিজের শরীরটা থেকেই বাইরে বেরিয়ে যান। ভগবানের দিব্যি। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই হাজার বার এইটা হয়েছে তাসত্ত্বেও অনেকের এটা মনে থাকে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার এই ব্যাপারটা সত্যি নয়।'[৩৩]

জোনাথন লিভিংস্টোন সীগল, এই একই নামের একটি উপন্যাসের নায়ক, যাকে লেখক রিচার্ড বাখ্ "আমাদের অন্তস্থ জ্বলন্ত সেই অত্যুজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ" রূপে বর্ণনা করেছেন, তাকে একের পর এক পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে পৃথিবী থেকে স্বর্গে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসতে হয়েছিল স্বল্প-ভাগ্য সম্পন্ন শঙ্খচিলদের উদ্দীপ্ত করার জন্য জোনাথনের এক পরামর্শদাতা পার্ষদ একবার তাকে প্রশ্ন করেছিল "তোমার কি কোনও ধারণা আছে যে, এই খাওয়া অথবা যুদ্ধ করা

অথবা দলের ক্ষমতার চেয়েও জীবনে আরও কিছু আছে এবং এই ধারণাটির প্রথম অনুভবের আগে পর্যন্ত আমাদের কতটি জীবনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়? এক হাজার, দশ হাজার। আর তারপরেও আরও একশত জীবন যতক্ষণ না আমরা শিখতে শুরু করছি, এই ধরনের এক পূর্ণতা রয়েছে এবং আবার আরও একশত বৎসর এই ধারণাটি লাভ করতে যে সেই পূর্ণতা লাভ করা ও সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়াই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।'[৩৪]

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আইজ্যাক বাশেভিস সিঙ্গার তার বিখ্যাত ছোট গল্পগুলোতে পুনর্জন্ম, পূর্বজন্ম ও আত্মার অমরত্বের কথা প্রায়ই বলতেন। "মৃত্যু হয় না যদি প্রত্যেকেই ভগবানের অংশ হয় তবে মৃত্যু হবে কেমন করে? আত্মা কখনও মরে না, শরীরও কখনও প্রকৃতই বেঁচে ওঠে না।'[৩৫]

বিখ্যাত ব্রিটিশ কবি জন মেসফিল্ড অতীত ও ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধে তার একটি সুপরিচিত কবিতায় লিখেছিলেন,

> আমি মনে করি যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়
> তার আত্মা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে
> নতুন কোন মাংসে পরিবৃত ছদ্মবেশে
> অন্য কোন মা তাকে জন্ম দেয়
> বলিষ্ঠ অঙ্গ ও আরও উন্নত মস্তিষ্কের সাথে
> সেই পুরোন আত্মা একই রাস্তায় আবার অগ্রসর হয়।'[৩৬]

সঙ্গীতজ্ঞ, গীতিকার এবং খ্যাতনামা বিটল গায়কদের অন্যতম জর্জ হ্যারিসনের পুনর্জন্মের বিষয়ে ঐকান্তিক চিন্তা, ব্যক্তি-পারস্পরিক সম্পর্কের উপর তাঁর নিজস্ব ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছে 'বন্ধুরা সকলেই আত্মা, তাই অন্য জীবনেও আমরা পরিচিত ছিলাম আমরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছি। বন্ধুদের বিষয়ে আমি এইভাবেই অনুভব করি। এমনকি তারা আমার একদিনের পরিচিত হলেও সেটি কোন

ব্যাপার নয়। তার সঙ্গে আমাকে দু'বছর ধরে পরিচিত হতে হবে এভাবেও আমি অপেক্ষা করতে রাজি নই। কেননা যেভাবেই হোক পূর্বে কখনও কোথাও আমরা মিলিত হয়েছিলাম।"

পশ্চিমের কিছু বুদ্ধিজীবি এবং সাধারণ মানুষের মন আবও একেবারে পুনর্জন্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সিনেমায়, উপন্যাসে, জনপ্রিয় গানে অথবা পত্র-পত্রিকায় পুনর্জন্মের কথা বারবার উঠে আসে। যার ফলে এর চর্চাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। লাখ লাখ পশ্চিমী লোক প্রত্যু প্রায় দেড় লাখ মানুষের পর্যায়ে চলে যাচ্ছেন যাদের মধ্যে রয়েছেন হিন্দু, বৌদ্ধ সম্প্রদায়, (Taoists) সহ অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ে বিশ্বাসী মানুষেরা। এরা নিজেদের ঐতিহ্য অনুযায়ী বোঝেন যে জন্মের পরই জীবন শুরু হয় না আর মৃত্যুর সাথে সাথেই তা শেষ হয়ে যায় না। কিন্তু সাধারণ কৌতূহল বা বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। এটিই পুনর্জন্ম বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানার প্রথম ধাপ। যার মধ্যে রয়েছে জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তন চক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার জ্ঞান।

ভগবদ্গীতা ঃ পুনর্জন্মের অনাদি উৎসগ্রন্থ

অনেক পশ্চিমী ব্যক্তি পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আরও অধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য অতীত ও বর্তমান জীবন সম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থগুলির দিকে ঝুঁকেছেন। সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদ হল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ। এতে পুনর্জন্ম বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া রয়েছে—যে শিক্ষা পাঁচ হাজার বছরের বেশী সময় ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে।

ভগবদ্গীতা হল বৈদিক জ্ঞান এবং উপনিষদের সারাংশ। এতে পুনর্জন্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত মৌলিক তথ্য পাওয়া যায়। পঞ্চাশ শতাব্দী আগে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য ও অন্তরঙ্গ মিত্র অর্জুনকে উত্তর ভারতের একটি রণক্ষেত্রে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন।

পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র আদর্শ স্থান, কারণ যুদ্ধতে মানুষ জীবন, মৃত্যু আর মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্নের সরাসরি সম্মুখীন হয়।

যখনই শ্রীকৃষ্ণ আত্মার অমরত্বের প্রসঙ্গে বলতে শুরু করেন তখন তিনি অর্জুনকে বলেন, "কখনও এরকম সময় ছিল না যখন আমি ছিলাম না, তুমিও ছিলে না, এইসব রাজারাও ছিল না, ভবিষ্যতেও আমাদের কারও অস্তিত্ব আটকে যাবে না।" গীতাতে এও নির্দেশ দেওয়া আছে "যা সমগ্র শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, তাকে তুমি অবিনাশী বলে জানবে। সেই অব্যয় আত্মাকে কেউ বিনাশ করতে সক্ষম নয়।" যে আত্মা সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করছি তা এতই সূক্ষ্ম যে আমরা আমাদের সীমিত মানব মন এবং চেতনা দিয়ে তার সত্যতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। এইকারণে সবাই আত্মার অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যবৎ দর্শন করেন, কেউ আশ্চর্যভাবে বর্ণনা করেন এবং কেউ আশ্চর্যজ্ঞানে শ্রবণ করেন, আর কেউ শুনে ও তাকে বুঝতে পারেন না।"

আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করা শুধুমাত্র কোন বিশ্বাসের ব্যাপার নয়। চেতনা ও যুক্তি দ্বারা এই বিষয়ে পুনর্বিচার করার জন্য ভগবদ্গীতা আমাদের আবেদন জানায়। যাতে করে অন্ধের মত বদ্ধ ধারণার বশীভূত না হয়ে আমরা এর কৌশলগুলিকে যুক্তিসম্মতভাবে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করতে পারি।

যদি আত্মা (real self) ও শরীরের মধ্যে পার্থক্য বোঝা না যায় তবে পুনর্জন্মকে বোঝা অসম্ভব। গীতা প্রকৃতির এই নিম্নলিখিত উদাহরণটি দ্বারা আত্মার স্বরূপ বুঝতে আমাদের সাহায্য করে—"সূর্য যেমন একাকী সমগ্র জগৎকে আলোকিত করে, তেমনি একমাত্র শরীরে মধ্যস্থ জীবাত্মাই সমগ্র দেহকে চেতনার দ্বারা আলোকিত করে।"

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা ও ভক্ত অর্জুনকে পুনর্জন্মের বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করছেন।

শরীরে আত্মার উপস্থিতির একটি মজবুত (Concrete) প্রমাণ হল চেতনা। মেঘলা দিনে আকাশে সূর্যকে দেখা যায় না। কিন্তু সূর্যালোকের অস্তিত্ব আছে বলে আমরা জানি যে দেখা না গেলেও সূর্য আকাশে রয়েছে একইভাবে আমরা আত্মাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, কিন্তু চেতনার উপস্থিতির জন্য আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আত্মা আছে। চেতনা না থাকলে শরীর কেবলমাত্র একটা জড় পদার্থের পিণ্ডে পরিণত হত। কেবলমাত্র চেতনার উপস্থিতির জন্য জড় পদার্থের পিণ্ডটি শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে, কথা বলতে পারে, ভালবাসতে পারে এবং ভয়ও পেয়ে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, শরীর হল আত্মার বাহন, যার মাধ্যমে সে তাঁর অসংখ্য জড় জাগতিক কামনা বাসনাকে পূরণ করতে পারে গীতায় বলা হয়েছে শরীরের মধ্যে জীবাত্মা 'জাগতিক শক্তি দ্বারা নির্মিত যন্ত্রের ভেতর অবস্থিত " আত্মা মিথ্যাই শরীরের সাথে পরিচয় করে এবং জীবনের বিভিন্ন ধারণাগুলিকে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে নিয়ে যায় যেমন বায়ু সুগন্ধকে বয়ে নিয়ে যায়। কোনও মোটরগাড়ী যেরকম চালক ছাড়া চলতে পারে না, তেমনি জড় দেহ আত্মাকে ছাড়া কোন কাজই করতে পারে না.

মানুষের যখন বয়স বাড়তে থাকে তখন জড় দেহ ও আত্মার প্রভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজের সারা জীবনে মানুষ দেখতে পায় যে কিভাবে শরীরের পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এটি স্থায়ী হয় না এবং সময়ই প্রমাণ করে শিশুটি ক্ষণজীবি শরীর একটি নির্দিষ্ট সময়ে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ গঠন পায়, সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে, ক্রমে তা ক্ষীণ হয়ে আসে ও মারা যায় এইজন্য জড় শরীর অনিত্য কারণ তা নির্দিষ্ট সময় পরে নষ্ট হয়ে যায়। গীতায় বলা হয়েছে, "অসত্যের অস্তিত্বই নেই " তবে জড় দেহের এত পরিবর্তন সত্ত্বেও শরীরের ভেতর আত্মার অন্যতম লক্ষণ চেতনা

অপরিবর্তিত থাকে। (সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না)। এইজন্য আমরা যুক্তিযুক্তভাবে সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে চেতনার স্থায়িত্বের একটি সহজাত গুণ রয়েছে যার ফলে শরীর মরে গেলেও এটি জীবিত থাকে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "আত্মার কখনও জন্ম বা মৃত্যু হয় না...শরীর মরে গেলেও আত্মা মরে না।"

কিন্তু যদি 'শরীর মরে গেলেও আত্মা মরে না' তবে আত্মার কি হয়? এর উত্তর দিয়ে ভগবদ্গীতাতেই বলা আছে যে আত্মা এরপর অন্য কোন দেহে প্রবেশ করে। এটাই পুনর্জন্ম। অনেকের পক্ষেই এই ধারণা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু এটি একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি এই ব্যাপারটি বোঝার জন্য গীতায় যুক্তিসম্মত উদাহরণ দেওয়া রয়েছে, "দেহীর দেহ যেভাবে কৌমার, যৌবন ও জরার মাধ্যমে তার রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোন দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।"

অন্য অর্থে মানুষের সমগ্র জীবনভরই পুনর্জন্ম হয়ে থাকে। যেকোনও জীববিজ্ঞানী আপনাকে বলবেন যে শরীরের কোষগুলি প্রতিনিয়ত মরতে থাকে এবং নতুন কোষ সেই স্থান পূরণ করে। অন্য অর্থে বলা যায় যে আমাদের প্রত্যেকেই এই জীবনে বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হই। একজন প্রাপ্তবয়স্কের শরীর তাঁর শৈশবের শরীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এত পরিবর্তন সত্ত্বেও শরীরের ভেতরের ব্যক্তিটি কিন্তু একই থাকেন। এরকমই ঘটে মৃত্যুর সময়। আত্মা শরীরের শেষ পরিবর্তনে পৌঁছে যায়। গীতায় বলা হয়েছে, "একজন ব্যক্তি যেমন পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করেন, আত্মাও সেরকম পুরাতন ও অব্যবহার্য (useless) শরীর পরিত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে।" এইভাবে আত্মা জন্ম ও মৃত্যুর অন্তহীন চক্রে প্রবেশ

করে। "যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং মৃত্যুর পরে তার আবারও জন্ম হবে।" ভগবান অর্জুনকে বললেন।

বেদে বলা হয়েছে ৮৪ ০০,০০০ জীব যোনী রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম জীবাণু থেকে মাছ, গাছ, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পাখি, পশু হয়ে মানুষ ও দেবতা। জড় জাগতিক বাসনা অনুযায়ী জীবাত্মা এই সকল যোনীতে ক্রমাগত জন্ম নিতে থাকে।

মন হল সেই যন্ত্র যা এই দেহপরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে, আত্মার নতুন থেকে নতুনতর দেহপরিবর্তনকে চালিত করে। গীতায় বলা হয়েছে, "যে অবস্থার কথা চিন্তা করে কেউ শরীর ত্যাগ করে সেই অবস্থাতেই সে ফিরে আসে (পরবর্তী জন্মে)।" আমরা সমগ্র জীবনে যা কিছু করি এবং ভাবি তার একটা প্রভাব আমাদের মনের ওপর পড়ে এবং এই সকল প্রভাবই সম্মিলিতভাবে মৃত্যুর সময় আমাদের ভাবনাকে প্রভাবিত করে। এই সকল ভাবনার গুণাবলির ওপর নির্ভর করে জড়া প্রকৃতি আমাদের একটি উপযুক্ত শরীর প্রদান করে। এই কারণে, আমাদের বর্তমানে যে ধরনের শরীর রয়েছে তা গত জন্মে মৃত্যুর সময় আমাদের চেতনার অভিব্যক্তি মাত্র।

"জীবাত্মা এইভাবে অন্য আরেকটি স্থূল দেহ প্রাপ্ত হয়, নির্দিষ্ট ধরনের চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রাপ্ত হয়, যেগুলি একসাথে মনকে কেন্দ্র করে থাকে। এইভাবে সে নির্দিষ্ট প্রকার ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ উপভোগ করে।" গীতায় এর ব্যাখ্যা দেওয়া রয়েছে। উপরন্তু, পুনর্জন্মের এই পথ সর্বদা উর্দ্ধমুখী নয়। কোন মানুষ যে পরবর্তী জন্মে মানুষ হয়েই জন্মাবে তাঁর কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি একজন কুকুরের মানসিকতা নিয়ে মারা যান, তবে পরবর্তী জন্মে চক্ষু, কর্ণ, নাক ইত্যাদি সব প্রাপ্ত হন কুকুরের মতন, এইভাবেই সে কুকুরের মতন দেহসুখ ভোগ করে।

১৬) *মেমোয়ার্স অব যোহানেস্ ফক।* লিপজিগ ঃ ১৮৩২ গোথে-বিবলিওথেক, পুনর্মুদ্রিত, বার্লিন ঃ ১৯১১।
১৭) *দ্য সিলেকটেড রাইটিংস অব রাল্ফ ওয়াল্ডো এমারসন,* সম্পাদক, ব্রুকস এ্যাটকিনসন, নিউ ইয়র্ক ঃ মর্ডান লাইব্রেরী, ১৯৫০, পৃঃ ৪৪৫
১৮) *এমারসন কমপ্লিট ওয়ার্কস।* বোষ্টন, হাউটোন মিফ্লিন, ১৮৮৬, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৫।
১৯) *দ্য জারনাল অব হেনরী ডি থরো।* বোষ্টন, হাউটোন মিফ্লিন, ১৯৪৯, ২, পৃঃ ৩০৬
২০) *ওয়াল্ট হুইটম্যান'স্ লিভস অব গ্রাস।* প্রথম সংস্করণ (১৮৫৫)। সম্পাদক ঃ ম্যালকোম্ম কাউলে নিউ ইয়র্ক ঃ ভাইকিং, ১৯৫৯
২১) *বালজাক, লা কমেদিয়ে হ্যমেঁন।* বোষ্টন, প্র্যাট, ১৯০৪, ৩৯ খণ্ড, পৃঃ ১৭৫-১৭৬
২২) ৩৯ অধ্যায়
২৩) মস্কো ঃ পত্রিকা, *দ্য ভয়েস অব ইউনিভার্সাল লাভ,* ১৯০৮, নং ৪০, পৃঃ ৬৩৪।
২৪) *মর্ডান থট এ্যাণ্ড ক্যাথোলিসিজম,* অনুবাদক, ফ্র্যাঙ্ক লেস্টার প্লিডওয়েল ব্যক্তিগতভাবে মুদ্রিত ১৯২৭ মূল পাণ্ডুলিপিটি এখন মিশৌরির, সেন্ট লুইজে, সেন্ট লুউজ আর্ট মিউজিয়ামে রাখা আছে।
২৫) *সানফ্রান্সিসকো এক্সামিনার,* অগাস্ট ২৮, ১৯২৮।
২৬) প্রথম অধ্যায় "ক্যাম্পিপসো।"
২৭) নিউ ইয়র্ক ঃ ম্যাকমিল্লান, ১৯১৯, পৃঃ ২৫২ ২৫৪।
২৮) নিউ ইয়র্ক ঃ নিউ ডাইরেকসন, ১৯৫১।
২৯) *মেমোরিজ, ড্রিমস, এ্যাণ্ড রিফ্লেকসন্,* নিউ ইয়র্ক, প্যান্থেয়ন, ১৯৬৩, পৃঃ ৩২৩।

৩০) *এভোল্যুশন এ্যাণ্ড ইথিকস্ এ্যাণ্ড আদার এসেজ।* নিউ ইয়র্ক ঃ আপেলটন, ১৮৯৪, পৃঃ ৬০-৬১।
৩১) *গান্ধীজ ট্রুথ।* নিউ ইয়র্ক ঃ নর্টন, ১৯৬৯, পৃঃ ৩৬
৩২) *ইয়ং ইণ্ডিয়া,* এপ্রিল ২, ১৯৩১, পৃঃ ৫৪।
৩৩) জে ডি. সালিংগার, *নাইন ষ্টোরিজ।* নিউ ইয়র্ক ঃ সিগনেট পেপার ব্যাক, ১৯৫৪।
৩৪) নিউ ইয়র্ক ঃ ম্যাকমিলন, ১৯৭০, পৃঃ ৫৩-৫৪
৩৫) *এ ফ্রেণ্ড অব কাফকা এ্যাণ্ড আদার ষ্টোরিজ।* নিউ ইয়র্ক ঃ ফারার, ষ্ট্রস এ্যাণ্ড গিরোক্স, ১৯৬২
৩৬) "এ ফ্রেন্ড" *কবিতা সংগ্রহ।*
৩৭) *আই, মি, মাইন* নিউ ইয়র্ক ঃ সাইমন এ্যাণ্ড শুস্টার, ১৯৮০।

কেউ স্বর্গ ও নরককে বিশ্বাস করে। তবুও অন্যরা বিশ্বাস করে যে আমাদের এই জীবন অনেক জীবনের একটি এবং আমরা ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকবো। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের একভাগেরও বেশী মানুষ—প্রায় দু'শো কোটি মানুষ— বিশ্বাস করে যে পুনর্জন্ম জীবনের এক অপ্রতিরোধ্য বাস্তব।

জন্মান্তর কোন 'বিশ্বাসীয় পন্থা' নয় বা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর করালগ্রাস থেকে পালিয়ে যাবার জন্য কোন মনস্তাত্ত্বিক উপায়ও নয়। এটি একটি বিস্তারিত বিজ্ঞান যা আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের বর্ণনা করে। এ বিষয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি অধিকাংশই 'সম্মোহিত প্রত্যাগমন' 'মৃত্যুর নিকট অভিজ্ঞতা', 'দেহের বাইরের অভিজ্ঞতার বিবরণ' অথবা 'কল্পনার চর্বিত-চর্বন' মাত্র।

কিন্তু জন্মান্তর সম্বন্ধীয় বেশীরভাগ সাহিত্যেই তথ্যের অভাব খুব কম, তা অতিরিক্ত জল্পনা-কল্পনা প্রসূত, ভাসা-ভাসা এবং সিদ্ধান্তবিহীন। কিছু কিছু বইয়ের উদ্দেশ্য থাকে এ ব্যাপারে এমন সব মানুষদের প্রামাণিক তথ্য পেশ করা যারা সম্মোহিতভাবে অতীত জীবনে ফিরে যেতে পারে। আগের জন্মে কোন গৃহে তারা বাস করত, কোন রাস্তায় তারা হাঁটত, কোন উদ্যানে তারা শিশুরূপে খেলা করত এবং তাদের অতীতের পিতা মাতা, বন্ধু ও আত্মীয় সকলের নাম তারা বর্ণনা করে। এই সমস্ত বইগুলো পড়তে বেশ আগ্রহের সঞ্চার হয় এবং যদিও এই বইগুলো সামগ্রিকভাবে জন্মান্তর সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ ও বিশ্বাসের সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে তথাকথিত এইসব পূর্বজন্মের কাহিনীর অধিকাংশই আনুমানিক, অসত্য এবং এমনকি প্রতারণাপূর্ণ।

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ যেটা, তা হল এইসব জনপ্রিয় বইয়ের কোনটিতেই যেভাবে সহজ পন্থার মাধ্যমে আত্মা নিত্যত্ব এক দেহ থেকে আরেকদেহে দেহান্তরিত হয়, জন্মান্তরের সেই মূল

ঘটনাটিকে কখনই ব্যাখ্যা করা হয় না। যদিওবা কখনও কোন দুর্লভ ক্ষেত্রে মূল সূত্রটি আলোচনা করা হয় তখন সাধারণতঃ কিভাবে এবং কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জন্মান্তর ঘটেছে সে ব্যাপারে লেখক তার নিজস্ব তত্ত্বের উপস্থাপন করে যেন কোন বিশেষ বা ভাগ্যবান জীবেরই জন্মান্তর ঘটে, অন্যদের তা হয় না। এই ধরনের উপস্থাপন কখনই জন্মান্তরের বিজ্ঞান-সম্মত নয় বরং তা পাঠকদের বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

যেমন ঃ জন্মান্তর কি সঙ্গে সঙ্গে ঘটে নাকি ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় ধরে ঘটে? অন্যান্য জীব যেমন পশুরাও কি মানবদেহে জন্মান্তরিত হতে পারে? মানুষও কি পশুরূপে আবির্ভূত হতে পারে? যদি তাই হবে, তবে তা কিভাবে এবং কেন? আমরা কি চিরকাল জন্মান্তরিত হয়ে যাবো নাকি এর কোথাও শেষ রয়েছে? আত্মাকে কি চিরকাল ধরে নরকে দুর্দশা ভোগ করতে হয় অথবা স্বর্গে চিরকাল উপভোগ করতে হয়? আমরা কি আমাদের ভাবী জন্মান্তরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি? কিভাবে? আমরা কি অন্য কোন গ্রহে কিম্বা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম নিতে পারি? আমাদের পরবর্তী দেহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের পাপ বা পুণ্যকর্মের কি কোন ভূমিকা আছে? কর্ম ও জন্মান্তরের মধ্যে সম্পর্কটি কি?

পুনরাগমন এই সকল প্রশ্নের পূর্ণ উত্তর প্রদান করছে, কেননা এই গ্রন্থটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে জন্মান্তরের প্রকৃত সত্যকে বর্ণনা করছে। শেষ পর্যন্ত, এই গ্রন্থটি কিভাবে রহস্যময় এবং সাধারণতঃ জন্মান্তরের ইন্দ্রিয়গোচর ভ্রান্তির নিরসন করে সঠিক অবস্থানে অবস্থিত থাকতে হবে সে বিষয়ে পাঠকদের ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করছে, কেননা মানুষের ভাগ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাস্তবতার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে দেহ একটি মানসিক কাঠামো মাত্র অনেকটা স্বপ্নের মতো। কিন্তু আত্মা এইসকল মানসিক কাঠামো থেকে ভিন্ন। এটিই আত্ম-উপলব্ধি।

২

পরিবর্তনশীল শরীর

১৯৭৪ সালে পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট সংলগ্ন এক গ্রাম্য পরিবেশে একটি ইসকনের মন্দিরে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের সঙ্গে অধ্যাপক কার্ল গ্রাফেন গ্রাফ ভন দুর্কহেইম এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী অধ্যাপক দুর্কহেইম একজন প্রখ্যাত ধর্মীয় মনোবিজ্ঞানী এবং 'ডেইলি লাইফ এজ স্পিরিচুয়াল এক্সারসাইজ' গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তিনি বিশ্লেষণমূলক মনোবিজ্ঞানে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন এবং ব্যাভেরিয়াতে চিকিৎসামূলক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য সনামধন্য হয়েছিলেন। এই কেন্দ্রটি চেতনসত্তার মনোবিজ্ঞানে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য উভয় প্রকার চর্চার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল। দুর্কহেইমের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতায় প্রভুপাদ পুনর্জন্ম সম্পর্কিত মূলনীতির সূত্রের প্রাথমিক এবং অতীব মূলগত ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন পারমার্থিক জীবসত্তা জড় জাগতিক দেহসত্তা থেকে ভিন্ন, চেতন আত্মসত্তা এবং শরীর এই দুটি পৃথক সত্তা। এই তত্ত্বটি প্রতিপন্ন করার পর শ্রীল প্রভুপাদ বিবৃত করেছেন কিভাবে চেতনসত্তা অর্থাৎ আত্মা অনন্তকাল যাবৎ মৃত্যুর পরে অন্য শরীরে দেহান্তরিত হয়ে চলেছে

প্রোফেসর দুর্কহেইম : কাজ করতে গিয়ে দেখেছি স্বাভাবিক অহংকার সহজে যেতে চায় না। কিন্তু আপনি যদি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যান তবে আপনার এক ভিন্ন অনুভূতি হবে

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ আলাদা অনুভূতিটা এরকম হয় যেন কোন রুগ্ন মানুষ পুনরায় সুস্থ শরীর লাভ করছেন
প্রোফেসর দুর্কহেইম ঃ তাহলে যে ব্যক্তি এইভাবে মারা যায় সে বাস্তবতার এক উচ্চতর পর্যায়কে অনুভব করতে পারে?
শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ব্যক্তি কখনও মারা যায় না, মারা যায় শরীরটা। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, শরীর সব সময়ই মৃত যেমন একটি মাইক্রোফোন ধাতু দিয়ে তৈরী যখন এই মাইক্রোফোনের মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি বাহিত হয় তখন এটি শব্দকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিবর্তিত করে, যার ফলে সেই শব্দ লাউডস্পীকারের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হয়। কিন্তু যদি এই ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ না থাকত, তবে এসব কিছুই করা সম্ভব হত না তাহলে মাইক্রোফোন সচল অথবা অচল যাই হোক না কেন সেটি ধাতু, প্লাস্টিক ইত্যাদির একটি সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই হত না সেইরকমই মানব-শরীর কাজকর্ম করে থাকে কারণ এর ভেতর জীবন্ত শক্তি রয়েছে যখন এই জীবন্তশক্তি চলে যায় তখন বলা হয় যে মানুষটি মৃত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব-শরীর সবসময়ই মৃত এখানে জীবন্ত শক্তিটিই হল মূল ব্যাপার এর উপস্থিতিতেই একটি শরীর জীবন্ত হয় কিন্তু 'মৃত' অথবা 'জীবিত' যাই হোক না কেন ভৌতিক শরীর কয়েকটি মৃত বস্তুর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।

গীতার প্রথম উপদেশটিই স্পষ্টভাবে একথা প্রকাশ করে যে জাগতিক শরীরের অবস্থাই শেষ অবধি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥

"পরমেশ্বর ভগবান বললেন তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে শোক করছ। যাঁরা যথার্থই পণ্ডিত তাঁরা কখনই জীবিত অথবা মৃত কারও জন্যই শোক করেন না।" (ভগবদ্গীতা ২/১১,

দার্শনিক প্রশ্নে মৃত শরীর প্রকৃত বিষয় নয় বরং সক্রিয় নীতি বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে—সেই নীতি যে এই মৃত শরীরকে সচল করে—সেটি হল আত্মা।
প্রোফেসর দুর্কহেইম ঃ আপনি আপনার শিষ্যদের কিভাবে এই শক্তি সম্বন্ধে জানাতে শিক্ষা দেন, যেটি কোনও পদার্থ নয়, কিন্তু পদার্থকে জীবিত করে? বুদ্ধিগত দিক দিয়ে আমি স্বীকার করছি যে আপনি এমন একটি দর্শনের কথা বলছেন, যার মধ্যে সত্য আছে। এই ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু কাউকে আপনি এটি অনুভব করাবেন কীভাবে?

কিভাবে আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এটি খুবই সহজ ব্যাপার। একটি সক্রিয় নীতি আছে যেটি শরীরকে চাঙ্গা করে যখন এটি থাকে না তখন শরীর আর চলাফেরা করতে পারে না। তাহলে মূল প্রশ্নটি হল, "এই সক্রিয় নীতিটি কি?" এই প্রশ্নটি সমস্ত বেদান্ত দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত-সূত্র শুরুতেই রয়েছে এই প্রবাদ অর্থাৎ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা—"শরীরের ভেতরের আত্মার স্বরূপ কি?" এজন্য বৈদিক-দর্শনের শিক্ষার্থীদের প্রথমে মৃত শরীর ও জীবিত শরীরের প্রভেদ বুঝতে হয় যদি সে এই তত্ত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তাকে তর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিচার করে দেখতে বলা হয় যেকেউ দেখতে পারেন, যে এই সক্রিয় নীতি অর্থাৎ আত্মার উপস্থিতির জন্য শরীরের কীরূপ পরিবর্তন হয়। এই সক্রিয় নীতির অনুপস্থিতিতে শরীরের কোনও পরিবর্তন হয় না, শরীর নড়াচড়া করতেও পারে না। সুতরাং শরীরের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কিছু আছে

শ্রীল প্রভুপাদ : হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ আলাদা। অনুভূতিটা এরকম হয় যেন কোন রুগ্ন মানুষ পুনরায় সুস্থ শরীর লাভ করছেন।

প্রোফেসর দুর্কহেইম : তাহলে যে ব্যক্তি এইভাবে মারা যায় সে বাস্তবতার এক উচ্চতর পর্যায়কে অনুভব করতে পারে?

শ্রীল প্রভুপাদ : ব্যক্তি কখনও মারা যায় না, মারা যায় শরীরটা। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, শরীর সব সময়ই মৃত। যেমন একটি মাইক্রোফোন ধাতু দিয়ে তৈরী। যখন এই মাইক্রোফোনের মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি বাহিত হয়, তখন এটি শব্দকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিবর্তিত করে, যার ফলে সেই শব্দ লাউডস্পীকারের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হয়। কিন্তু যদি এই ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ না থাকত, তবে এসব কিছুই করা সম্ভব হত না। তাহলে মাইক্রোফোন সচল অথবা অচল যাই হোক না কেন সেটি ধাতু, প্লাস্টিক ইত্যাদির একটি সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই হত না। সেইরকমই মানব-শরীর কাজকর্ম করে থাকে কারণ এর ভেতর জীবন্ত শক্তি রয়েছে। যখন এই জীবন্তশক্তি চলে যায় তখন বলা হয় যে মানুষটি মৃত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব-শরীর সবসময়ই মৃত। এখানে জীবন্ত শক্তিটিই হল মূল ব্যাপার। এর উপস্থিতিতেই একটি শরীর জীবন্ত হয়। কিন্তু 'মৃত' অথবা 'জীবিত' যাই হোক না কেন ভৌতিক শরীর কয়েকটি মৃত বস্তুর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।

গীতার প্রথম উপদেশটিই স্পষ্টভাবে একথা প্রকাশ করে যে জাগতিক শরীরের অবস্থাই শেষ অবধি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান বললেন: তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে শোক করছ। যাঁরা যথার্থই পণ্ডিত তাঁরা কখনই জীবিত অথবা মৃত কারও জন্যই শোক করেন না।" (ভগবদ্গীতা ২.১১)

দার্শনিক প্রশ্নে মৃত শরীর প্রকৃত বিষয় নয়। বরং সক্রিয় নীতি নিয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে—সেই নীতি যে এই মৃত শরীরকে সচল করে—সেটি হল আত্মা।

প্রোফেসর দুর্কহেইম : আপনি আপনার শিষ্যদের কিভাবে এই শক্তি সম্বন্ধে জানতে শিক্ষা দেন, যেটি কোনও পদার্থ নয়, কিন্তু পদার্থকে জীবিত করে? বুদ্ধিগত দিক দিয়ে আমি স্বীকার করছি যে আপনি এমন একটি দর্শনের কথা বলছেন, যার মধ্যে সত্য আছে। এই ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কাউকে আপনি এটি অনুভব করাবেন কীভাবে?

কিভাবে আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়

শ্রীল প্রভুপাদ : এটি খুবই সহজ ব্যাপার। একটি সক্রিয় নীতি আছে যেটি শরীরকে চালনা করে। যখন এটি থাকে না তখন শরীর আর চলাফেরা করতে পারে না। তাহলে মূল প্রশ্নটি হল, "এই সক্রিয় নীতিটি কি?" এই প্রশ্নটি সমস্ত বেদান্ত দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত-সূত্র শুরুতেই রয়েছে এই প্রবাদ অর্থাৎ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা—'শরীরের ভেতরের আত্মার স্বরূপ কি?" এজন্য বৈদিক-দর্শনের শিক্ষার্থীদের প্রথমে মৃত শরীর ও জীবিত শরীরের প্রভেদ বুঝতে হয়। যদি সে এই তত্ত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তাকে তর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিচার করে দেখতে বলা হয়। যেকেউ দেখতে পারেন, যে এই সক্রিয় নীতি অর্থাৎ আত্মার উপস্থিতির জন্য শরীরের কীরূপ পরিবর্তন হয়। এই সক্রিয় নীতির অনুপস্থিতিতে শরীরের কোনও পরিবর্তন হয় না, শরীর নড়াচড়া করতেও পারে না। সুতরাং শরীরের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কিছু আছে

যার জন্য শরীর নড়াচড়া করতে পারে। এটা বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না।

শরীর সবসময়ই মৃত। এটি একটি বড় মেশিনের মতন। একটি টেপরেকর্ডারও জড় পদার্থ দিয়ে তৈরী। কিন্তু যখনই কোন ব্যক্তি তার কোন বোতাম টিপে দেয়, তখনই সেটা কাজ করতে শুরু করে। একইভাবে শরীরও জড় পদার্থ দিয়ে গঠিত। কিন্তু শরীরের ভেতর রয়েছে জীবনীশক্তি। যতক্ষণ এই আত্মা শরীরের মধ্যে থাকে ততক্ষণ শরীর সাড়া দেয় এবং জীবন্ত থাকে। ঘটনাচক্রে, আমাদের সবারই কথা বলার ক্ষমতা আছে। যদি আমি আমার কোনও ছাত্রকে আসতে বলি, সে আসবে। কিন্তু যদি সক্রিয় নীতি অর্থাৎ আত্মা তার শরীর ছেড়ে চলে যায় তবে আমি তাকে হাজার বছর ধরে ডাকলেও সে আসবে না। খুব সহজেই এই ব্যাপারটা বোঝা যায়।

কিন্তু এই সক্রিয় নীতিটি প্রকৃতপক্ষে কি? এটা একটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রারম্ভে।

প্রোফেসর দুর্কহেইম : আমি বুঝতে পারছি যে আপনি মৃত শরীর সম্বন্ধে কি বলতে চাইছেন—যে শরীরের মধ্যে এমন কিছু উপস্থিত থাকতে হবে যেটি শরীরকে সচল রাখতে পারে। আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এখানে দুটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে—একটি হল শরীর, অন্যটি সক্রিয় নীতি। কিন্তু আমার মূল প্রশ্ন হল, কিভাবে আমরা এই সক্রিয় নীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সচেতন হব? আমাদের আভ্যন্তরিন (আধ্যাত্মিক) পথে এই বাস্তবতার অনুভব করা কি সত্যই মহত্ত্বপূর্ণ নয়?

"আমি ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মা"

শ্রীল প্রভুপাদ : আপনি নিজেই হলেন সেই সক্রিয় নীতি। জীবন্ত শরীর এবং মৃত শরীরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে

একমাত্র পার্থক্য হল সক্রিয় নীতির অনুপস্থিতি। যখন এই সক্রিয় নীতি থাকে না তখন শরীরকে মৃত বলা হয়। সুতরাং আত্মাই হল এই সক্রিয় নীতি। বেদে আমরা এই সূত্র পাই *সোঽহম্*—"আমিই হলাম সক্রিয় নীতি।" সেখানে আরও বলা হয়েছে—*অহম্ ব্রহ্মাস্মি* : আমি এই জাগতিক শরীর নই। আমিই ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মা। এটাই হল আত্ম উপলব্ধি। যিনি আত্মা উপলব্ধি করেছেন তাকে ভগবৎ গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে—ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি—যখন মানুষ আত্ম-উপলব্ধি করতে পারে তখন সে কোন শোকও করে না, কোন আকাঙ্ক্ষাও করে না। *সমঃ সর্বেষু ভূতেষু*—সে সব প্রাণী যেমন মানুষ, পশু ও অন্যান্য জীবদের প্রতি সমান ব্যবহার করে।

প্রোফেসর দুর্কহেইম : মনে করুন, আপনার কোনও শিষ্য বলল, 'আমি আত্মা'। কিন্তু সে সেটা অনুভব করতে পারছে না।

শ্রীল প্রভুপাদ : কেন সে অনুভব করতে পারবে না? সে জানে যে সে সক্রিয় আত্মা। প্রত্যেকেই জানে যে সে এই শরীর নয়। এমনকি একটা বাচ্চাও জানে। আমরা যেভাবে কথা বলি তারে পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এটা বুঝতে পারি। আমরা বলে থাকি যে 'এটা আমার আঙ্গুল।' আমরা কখনই বলি না, 'আমি আঙ্গুল'। তাহলে এই 'আমি' কে? এটাই হল আত্ম উপলব্ধি—'আমি এই শরীর নই'।

এই অনুভূতি অন্য পশুদের মধ্যেও প্রভাবিত করা যায়। কেন মানুষ পশুদের হত্যা করবে? কেন অন্যদের যন্ত্রণা দেয়? যে আত্ম-সচেতন সে দেখতে পারে, 'এখানে অন্য একটি আত্মা আছে। তার শুধু অন্য আর এক রকম শরীর আছে। কিন্তু যে সক্রিয় নীতি আমার শরীরে আছে, তেমনি ওর শরীরের সক্রিয় আত্মা কাজ করছে। যে ব্যক্তি আত্ম-সচেতন তিনি সকল জীবকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেন

কারণ তিনি জানেন যে আত্মা শুধু মানুষের শরীরেই থাকে না বরং পশু, পাখী মাছ, কীটপতঙ্গ, গাছ প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মা রয়েছে।

এই জীবনেই পুনর্জন্ম

সক্রিয় নীতি হল আত্মা। মৃত্যুর সময় আত্মা এক শরীর থেকে অন্য শরীরে দেহান্তরিত হয়। শরীর ভিন্ন হলেও আত্মা একই থাকে আমরা আমাদের জীবনকালেই এই শারিরীক পরিবর্তন দেখতে পাই আমাদের দেহ শৈশব থেকে কৈশোরে রূপান্তরিত হয়, কৈশোর থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে প্রৌঢ় অবস্থায়। যদিও সবসময়ই আত্মা একই রয়েছে শরীর হল জাগতিক এবং আত্মা হল আধ্যাত্মিক যখন কেউ এটি বুঝতে পারে, তখনই সে আত্মজ্ঞান লাভ করে

প্রোফেসর দুর্কহেইম ঃ আমি বুঝতে পারছি যে পশ্চিমি দেশে আমরা এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ের দিকে চলেছি, কারণ আমাদের ইতিহাসে এই প্রথম আমরা, ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষরা, আভ্যন্তরিন অভিজ্ঞতাগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে যা প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরে পূর্ব দেশের দার্শনিকরা নিঃসন্দেহে জানেন যে কিভাবে মৃত্যুর ভয়াবহ রূপকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় এবং একটি সম্পূর্ণ জীবন লাভ করা যায়

যেকোনও মানুষেরই এই অনুভূতির প্রয়োজন নিজের সামান্য শারিরীক অভ্যাসগুলোকে আয়ত্তে আনার জন্য যদি তারা এইসব শারিরীক অভ্যাসগুলোকে জয় করতে পারে তবে তারা হঠাৎই উপলব্ধি করতে পারে যে একেবারে একটি অন্য নীতি তাদের ভেতর কাজ করছে যার ফলে তারা 'আভ্যন্তরীন জীবন' সম্বন্ধে সচেতন হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা এটা সহজেই বুঝতে পারেন। কারণ তারা এটা কখনই ভাবেন না যে 'আমি হলাম এই শরীর' তারা মনে করে, *অহম্ ব্রহ্মাস্মি*—'আমি হলাম আত্মা'।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রথম যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেটি হল—হে অর্জুন, তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, সে বিষয়ে শোক করছ যাঁরা যথার্থই পণ্ডিত তাঁরা কখনও জীবিত অথবা মৃত কারও জন্যই শোক করেন না " আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এটাই প্রথম উপলব্ধি এই জগতের প্রত্যেকেই তাদের শরীর বিষয়ে সচেতন থাকে যতদিন তাঁরা বেঁচে থাকে ততদিন বিভিন্নভাবে শরীরের যত্ন করে তারপর যখন সে মরে যায় তখন লোক তার ওপর মূর্তি বা স্মৃতিসৌধ তৈরী করে। এটাই দেহাত্মবুদ্ধি সচেতনতা কিন্তু কেউই সক্রিয় নীতিকে উপলব্ধি করতে পারে না, যে সক্রিয় নীতি শরীরকে সৌন্দর্য ও জীবন দেয় মৃত্যুর সময় কেউ বুঝতে পারে না যে সেই সক্রিয় নীতি অর্থাৎ আত্মা কোথায় গেল এটাই নির্বুদ্ধিতা

প্রোফেসর দুর্কহেইম ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি যুবক ছিলাম আমি তখন চার বছর কাটিয়েছিলাম আমি আমার রেজিমেন্টের দুইজন অফিসারের মধ্যে একজন ছিলাম যে আহত হয়নি যুদ্ধক্ষেত্রে আমি শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু দেখেছিলাম আমি দেখেছিলাম আমার পাশের লোকটি আঘাত পেল আর হঠাৎ মরে গেল তাহলে আপনি বলতে চাইছেন যে মৃত্যুর পর যা পড়ে রইল সেটা শুধু একটা আত্মাবিহীন শরীর মাত্র কিন্তু যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসল এবং আমি বুঝলাম যে আমাকেও মরতে হবে, তখন আমি অনুভব করতে পারলাম যে আমার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যার সাথে মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ এটাই আত্ম উপলব্ধি।

প্রোফেসর দুর্কহেইম ঃ এই অভিজ্ঞতাটাই আমাকে গভীরভাবে ছুঁয়ে যায়। এটাই আমার আধ্যাত্মিক পথে প্রবেশের সোপান।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ বেদে বলা হয়েছে যে *নারায়ণ-পরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি* যদি কেউ ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন, তবে সে আর অন্য কিছুতে ভয় করবে না।

প্রোফেসর দুর্কহেইম ঃ আত্ম উপলব্ধির প্রক্রিয়া আভ্যন্তরিন অনুভূতির একটি পর্যায়মাত্র। এরকম কি নয়? এখানে ইউরোপের মানুষদেরও এরকম অনুভূতি হয়েছে বাস্তবিকপক্ষে, আমি বিশ্বাস করি যে ইউরোপের সবচেয়ে বড় সম্পত্তি হল এই যে এখানকার অনেক মানুষেরই যুদ্ধক্ষেত্র, বন্দি শিবির এবং বোমা-আক্রমণের অভিজ্ঞতা আছে। যার ফলে তাদের প্রত্যেকের ভেতরই মৃত্যুর কাছাকাছি যাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই সাথে এই অভিজ্ঞতাও আছে যে তারা আহত হয়েছে এবং শরীরের কোন না কোন অংশ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। তখন অন্তত সেই মুহূর্তটুকুতে তারা সনাতন অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে কিন্তু এখন সবাইকে বোঝানোর সময় এসেছে যে এই আভ্যন্তরিন অভিজ্ঞতা উপলব্ধির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বা বন্দি শিবিরে যাওয়ার দরকার নেই যখন মানুষ দিব্য সত্তার সন্ধান পাবে তখনই সে বুঝতে পারবে যে শরীরের অস্তিত্বই সব নয়

শরীর স্বপ্নের মতন

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ প্রত্যেক রাতেই আমরা এরকম অভিজ্ঞতা লাভ করি। যখন আমরা স্বপ্ন দেখি, আমাদের শরীর শুয়ে থাকে বিছানায় কিন্তু আমরা অন্য কোথাও চলে যাই এইভাবে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে আমাদের প্রকৃত পরিচয় আমাদের শরীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যখন ঘুমাই তখন আমরা ভুলে যাই যে আমরা বিছানায় শুয়ে আছি। আমরা তখন বিভিন্ন শরীরে বিভিন্ন স্থানে কাজ করি একইভাবে দিনের বেলায় আমরা আমাদের সেই স্বপ্নের শরীরকে ভুলে যাই

আমাদের স্বপ্নের শরীরের মাধ্যমে আমরা আকাশেও যেতে পারি রাতে আমরা আমাদের জাগ্রত শরীরকে ভুলে যাই ঠিক একইভাবে দিনের বেলা আমরা স্বপ্নের শরীরকে ভুলে যাই কিন্তু আমাদের আত্মা সবসময় জীবন্ত থাকে এবং আমরা এই দুটো শরীরেই নিজেদের অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারি যার ফলে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আমরা এই দুটো শরীরের মধ্যে কোনটাই নই কিছু সময়ের জন্য আমরা একটা শরীর পাই তারপর মৃত্যুর সময় আমরা তাকে ভুলে যাই বাস্তবিকপক্ষে শরীর একটি মানসিক গঠন মাত্র আত্মা এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এটাই আত্ম উপলব্ধি ভগবদ্গীতায় (৩ ৪২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে,

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥

"স্থূল জড় পদার্থ থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেয়, ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মন শ্রেয় মন থেকে বুদ্ধি শ্রেয়, আর তিনি (আত্মা) সেই বুদ্ধি থেকেও শ্রেয় "

প্রোফেসর দুর্কহেইম ঃ আপনি আত্মাকে আগে মিথ্যা অহংকার সম্বন্ধে বলেছেন। তাহলে কি আপনি বলতে চান যে প্রকৃত অহংকার হল আত্মা।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, এটাই প্রকৃত অহংকার। এই মুহূর্তে আমি সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ ভারতীয়ের শরীর ধারণ করে আছি আমার এই মিথ্যে অহংকার আছে যে "আমি একজন ভারতীয়," "আমি হলাম এই শরীর " এটাই হল ভুল ধারণা কোন এক দিন এই নশ্বর দেহ বিলীন হয়ে যাবে এবং অন্য একটি নশ্বর দেহ লাভ করব এটা একটি সাময়িক ভ্রান্ত ধারণা আসল সত্য হল আত্মা তার আকাঙ্ক্ষা ও কাজকর্মের ওপর নির্ভর করে এক শরীর থেকে অন্য শরীর লাভ করে

প্রোফেসর দুর্কহেইম : আত্মা কি ভৌতিক শরীর থেকে পৃথক হয়ে অন্য রূপ ধারণ করে থাকতে পারে?

শ্রীল প্রভুপাদ : হ্যাঁ। শুদ্ধ আত্মার কোন জড় দেহের প্রয়োজন হয় না। যেমন, আপনি যখন স্বপ্ন দেখেন, আপনি তখন নিজের বর্তমান শরীরকে ভুলে যান, কিন্তু তখনও আপনার চেতনা থাকে। আত্মা জলের মতন। জল শুদ্ধ। কিন্তু যখনই জল আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে ভূমিকে স্পর্শ করে, তখনই তা কর্দমাক্ত হয়ে যায়।

প্রোফেসর দুর্কহেইম : হ্যাঁ।

শ্রীল প্রভুপাদ : একইভাবে, আমরা হলাম আত্মা, আমরা শুদ্ধ, কিন্তু যখনই আমরা আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে সরে এই জড় দেহ প্রাপ্ত হই, তখনই আমাদের চেতনা ঢাকা পড়ে যায়। চেতনা শুদ্ধ থাকে, কিন্তু তখন তা কাদায় (জড় দেহ) আবৃত হয়ে যায়। এই কারণে মানুষ লড়াই করে। ভুলবশত সে নিজেকে শরীর মনে করে। সে ভাবে 'আমি জার্মান', 'আমি ইংরেজ' 'আমি কালো', 'আমি সাদা', 'আমি এইরকম', 'আমি ঐরকম'—এইভাবে নিজেকে বিভিন্ন শারীরিক পরিচয়ে পরিচিত করে। শারীরিক এই সকল উপাধি অশুদ্ধ। এই কারণেই শিল্পীরা নগ্ন চিত্র আঁকে অথবা নগ্ন মূর্তি তৈরী করে। যেমন ফ্রান্সে নগ্নতাকে শুদ্ধ বলে মনে করা হয়। একইভাবে যখন আপনি আত্মার নগ্নতাকে অথবা তাঁর প্রকৃত অবস্থাকে—এইসব শারীরিক পরিচয় ছাড়া বুঝতে পারবেন, তখনই তা শুদ্ধ হবে।

প্রোফেসর দুর্কহেইম : আত্মা শরীর থেকে পৃথক—এই তত্ত্বটি বুঝতে এত অসুবিধে হয় কেন?

প্রত্যেক ব্যক্তি জানেন 'আমি এই শরীরটি নই'

শ্রীল প্রভুপাদ : এটা কোন কঠিনই নয়, আপনি এর অনুভব করতে পারেন। কিন্তু নির্বুদ্ধিতার জন্য মানুষ ভাবে অন্যরকম. কিন্তু প্রত্যেকেই

প্রকৃত তথ্যটি জানে, 'আমি এই শরীর নই'। খুব সহজেই এটি অনুভব করা যায়। আমার অস্তিত্ব রয়েছে। আমি সহজেই বুঝতে পারি যে আমি একটি শিশুর শরীরে অবস্থান করেছি। এইরকমভাবে আমি অনেক শরীরে অবস্থান করেছি, এখন আমি একটি বৃদ্ধের শরীরে অবস্থান করছি। অথবা উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনি এখন একটা কালো কোট পড়ে রয়েছেন। পরমুহূর্তেই আপনি একটা সাদা কোট পড়তে পারেন। আপনি নিজে কিন্তু সাদা অথবা কালো কোট নন। আপনি শুধুমাত্র আপনার কোটটি বদল করেছেন। আমি যদি আপনাকে 'মিঃ ব্ল্যাক কোট' বলে ডাকি তবে সেটা হবে আমার নির্বুদ্ধিতা। একইভাবে আমার সমস্ত জীবনে আমি অনেক শরীর পরিবর্তন করেছি। আমি কিন্তু এর মধ্যে কোন শরীরই নই। এটাই প্রকৃত জ্ঞান।

প্রোফেসর দুর্কহেইম : কিন্তু এর মধ্যে আপনি কোন অসুবিধে দেখছেন না? যেমন, বুদ্ধি দিয়ে আপনি ভালো মতন বুঝে গেছেন যে আপনি এই শরীর নন—তাসত্ত্বেও কিন্তু আপনি মৃত্যুকে ভয় পান। তার মানে কি এই নয় যে আপনি বিষয়টা বুঝতে পারলেও অনুভব করতে পারেন নি। যদি আপনি সত্যিই তা অনুভব করতে পারতেন তবে আপনি কখনই মৃত্যুভয় করতেন না। কারণ আপনি তখন জানেন যে আপনি নিজে কখনও মরতে পারেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ : এই অভিজ্ঞতাটা যার প্রকৃত জ্ঞান আছে সেরকম কোনও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হয়। বছরের পর বছর ধরে, আমি শরীর নই। এইটি অনুভব করার চেষ্টা না করে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এই জ্ঞানটি আহরণ করতে পারি। তখন কোন সদ্গুরুর কাছ থেকে শুনে আমি আমার অমরত্বকে অনুভব করতে পারি। এটাই প্রকৃত বিধি।

প্রোফেসর দুর্কহেইম : হ্যাঁ, আমি বুঝেছি

আপনি এখন একটি কালো কোট পরছেন। পর মুহূর্তেই আপনি একটি সাদা কোট পরতে পারেন। কিন্তু আপনি সেই কালো বা সাদা কোটটি নন। আপনি কেবল কোটটি পরিবর্তন করছেন মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এইজন্য বেদে উপদেশ দেওয়া হয়েছে— *তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ* অর্থাৎ 'জীবনের পূর্ণতার শ্রেষ্ঠতম অনুভব পাওয়ার জন্য আপনাকে গুরুর কাছে যেতে হবে।' গুরু কে? কার কাছে আমাকে যেতে হবে? আমাকে তাঁর কাছেই যেতে হবে যে তাঁর গুরুর কাছ থেকে যথাযথভাবে শুনেছে। একেই বলে গুরু-শিষ্য পরম্পরা। আমি একজন যথার্থ ব্যক্তির কাছ থেকে শুনেছি এবং আমি সেই জ্ঞানের কোনও পরিবর্তন না করে একইভাবে তা বিতরণ করছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় আমাদের জ্ঞান প্রদান করেছেন এবং সেই জ্ঞানের কোন পরিবর্তন না করে আমরা তা বিতরণ করছি।

প্রোফেসর দুর্কহেইম ঃ গত কুড়ি-ত্রিশ বছর ধরে বিশ্বের পশ্চিমী দেশগুলোতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আগ্রহ গড়ে উঠেছে। কিন্তু অন্য দিকে, যদি বিজ্ঞানীরা মানুষের আত্মাকে নষ্ট করে দিতে চায়, তবে তাঁরা নিজেদের পরমাণু বোম এবং অন্যান্য কারিগরী আবিষ্কারের মাধ্যমে তা করতে পারে। যদি তাঁরা মানবতাকে উচ্চতর লক্ষ্যে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে তাদের নিজেদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানুষকে জড়পদার্থ রূপে দেখা বন্ধ করতে হবে। তাদের আমাদেরকে দেখতে হবে, আমরা যেরকম—সচেতন আত্মা।

মানব জীবনের লক্ষ্য

আত্ম-অনুভূতি বা ঈশ্বর অনুভূতিই হল মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। কিন্তু বিজ্ঞানিরা তা জানে না। বর্তমানে আধুনিক সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছে কিছু অন্ধ ও নির্বোধ ব্যক্তি। তথাকথিত প্রযুক্তিবিদ, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকরা জানে না মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। তাই তাঁরা অন্ধের মতন কাজ করে। এজন্য আমরা এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি যেখানে অন্ধরা অন্ধদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাই যদি একজন অন্ধ লোক অন্য আরেক অন্ধকে পথ দেখাতে চেষ্টা করে, তাহলে

কি ফলাফল আশা করা যায়? না। এই পদ্ধতিটি ঠিক নয়। যদি কেউ প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করতে চায় তবে তাকে একজন আত্ম উপলব্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে যেতে হবে।

(আরও কিছু ব্যক্তি ঘরে ঢুকল)

শিষ্য ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, এই ভদ্রলোকেরা ধর্ম বিজ্ঞান ও দর্শনের অধ্যাপক এবং ইনি ডাক্তার ভরা ইনি জার্মানিতে যোগ-শিক্ষা ও পূরক দর্শন (Integral Ph losophy) সংস্থার প্রধান পদে রয়েছেন।

(শ্রীল প্রভুপাদ তাদের অভ্যর্থনা করলেন এবং কথোপকথন পুনরায় শুরু হল)

প্রোফেসর দুর্কহেইম ঃ আমি অ রেকটা প্রশ্ন করতে পারি? অনুভূতির কি অন্য কোনও স্তর নেই যা সাধারণ মানুষের সামনে আত্ম-উপলব্ধির পথ খুলে দেবে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, এই অনুভূতি ভগবদ্গীতায় (২/১৩) বর্ণনা করা হয়েছে

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহীর দেহ যেভাবে কৌমার, যৌবন ও জরার মাধ্যমে তার রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোন দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।"

কিন্তু প্রথমে একজনকে বুঝাতে হবে জ্ঞানের প্রকৃত নীতিটি—যে আমি এই শরীরটি নই যখন একজন কেউ এই মূল নীতিটি বুঝতে পারবে, তখনই সে আরও গভীর জ্ঞানে প্রবেশ করতে পারবে

প্রোফেসর দুর্কহেইম ঃ আমার মনে হচ্ছে আত্মা ও শরীর সম্পর্কিত এই সমস্যা নিয়ে পশ্চিমী দেশগুলো ও পূর্বের দেশগুলোর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির বড় পার্থক্য রয়েছে পূর্বের দেশগুলোতে শিক্ষা দেওয়া

জন্মান্তরের অর্থ হল যে, আমি এক আত্মা যে একটি দেহে প্রবেশ করি পরবর্তী জীবনে আমি অন্য একটি দেহেও প্রবেশ করতে পারি সেটি একটি কুকুরের দেহও হতে পারে, কিম্বা একটি বিড়ালের দেহ অথবা এক রাজার দেহও হতে পারে

হয় আপনাকে শরীর থেকে মুক্ত হতে হবে, সেখানে পশ্চিমী ধর্ম অনুসারে মানুষ নিজের শরীরে মধ্যস্থ আত্মাকে অনুভব করতে চেষ্টা করে

শ্রীল প্রভুপাদ : এটা খুব সহজেই বোঝা যায় ভগবদ্গীতায় আমরা শুনেছি যে আমরা হলাম আত্মা, সেই আত্মা শরীরের মধ্যে রয়েছে এই শরীরের সাথে পরিচয়ই আমাদের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের মূল কারণ কারণ আমি এই শরীরের ভেতর প্রবেশ করেছি বলে দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি তাই পূর্ব বা পশ্চিম যাই হোক না কেন, আমার আসল কাজ এই শরীরের বাইরে বের হয়ে আসা। এই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝাতে পারছেন?

প্রোফেসর দুর্কহেইম : হ্যাঁ।

শ্রীল প্রভুপাদ : পুনর্জন্ম—শব্দটির অর্থ হল আমি হলাম আত্মা, যে একটা শরীরে প্রবেশ করেছে কিন্তু পরের জন্মে আমি অন্য আরেকটা শরীরে প্রবেশ করব এটা হতে পারে কোনও কুকুরের শরীর, কোনও বিড়ালের শরীর, অথবা কোনও রাজার শরীর কিন্তু কুকুরের হোক বা রাজার সবেতেই দুঃখ কষ্ট রয়েছে এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছে জন্ম, মৃত্যু, জরা-ব্যাধি তাই এই চাররকম দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে হলে, আমাদেরকে শরীরের বাইরে বেরোতে হবে। এটাই আমাদের আসল সমস্যা—কিভাবে এই জড় জাগতিক শরীর থেকে মুক্ত হব?

প্রোফেসর দুর্কহেইম : এতে অনেক বছর সময় লাগে?

শ্রীল প্রভুপাদ : এতে বহু জন্ম লেগে যেতে পারে, অথবা আপনি এই জন্মেই এটা করতে পারেন যদি আপনি এই জন্মেই বুঝতে পারেন যে আপনার এত দুঃখ-কষ্টের মূলে রয়েছে এই শরীর তাহলে আপনি নিশ্চয়ই এই শরীর থেকে বেরোনোর পথ খুঁজবেন যখন আপনি এই জ্ঞান পেয়ে যাবেন তখন আপনি সেই পদ্ধতিকেই বেছে নেবেন যা শীঘ্রই আপনাকে শরীরের বাইরে নিয়ে যাবে

প্রোফেসর দুর্কহেইম : কিন্তু এর মানে তো এই নয় যে আমি এই শরীরকে মেরে ফেলব, তেমন তো নয়? এর তাৎপর্য কি এই নয়, আমি বুঝতে পারব যে আমার শরীর ও আত্মা স্বতন্ত্র

শ্রীল প্রভুপাদ : না, শরীরকে মেরে ফেলার কোনও দরকার নেই কিন্তু আপনার শরীর মরে যাক আর না যাক, কোন না কোন দিন আপনাকে এই শরীর ত্যাগ করতে হবে এবং অন্য একটা শরীর গ্রহণ করতে হবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম আপনি এটাকে বদলাতে পারবেন না

প্রোফেসর দুর্কহেইম : মনে হচ্ছে এর মধ্যে কিছু বিষয় খ্রীস্টান ধর্মের মতন।

শ্রীল প্রভুপাদ : এটা কোনও ব্যাপার নয় যে আপনি খ্রীস্টান, মুসলিম না হিন্দু জ্ঞান হল জ্ঞানই যেখানেই কোন জ্ঞান পাওয়া যাবে তাকে গ্রহণ করতে হবে জ্ঞান হল—প্রত্যেক জীবাত্মা একটি শরীরের মধ্যে বদ্ধ এইজন্য তাকে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ভোগ করতে হয় কিন্তু আমরা অনন্ত কাল বেঁচে থাকতে চাই আমরা পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে চাই, আমরা পূর্ণ আনন্দ চাই আর এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আমাদেরকে শরীরের বাইরে বেরোতে হবে এটাই পদ্ধতি

প্রোফেসর ডবা : আপনি জোর দিয়ে বললেন যে আমাদের শরীরের বাইরে বেরোতে হবে। কিন্তু মানুষ রূপে আমরা আমাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে পারব না?

শ্রীল প্রভুপাদ : আপনার প্রস্তাব হল মানুষ রূপে আমাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করা আপনি কি মনে করেন যে এই মানব শরীরই আদর্শ?

প্রোফেসর ডবা : না, আমি বলছি না যে এটাই আদর্শ। কিন্তু আমাদের এটা স্বীকার করা উচিত এবং অন্য কোন আদর্শ পরিস্থিতি তৈরীর চেষ্টা না করা উচিত।

কিভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হব

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আপনি মনে করেন আপনার স্থিতি আদর্শ নয়। এইজন্য প্রকৃত পন্থা হল কিভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায় তা খুঁজে বের করা।

প্রোফেসর ডরা ঃ কিন্তু আত্মা রূপে আমাদের পূর্ণতা হবার কেন প্রয়োজন? আমরা মানুষ রূপে কেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারি না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আপনি পূর্বেই স্বীকার করেছেন যে এই শরীরের মধ্যে আপনার অবস্থান যথাযথ নয়। তাহলে আপনি এই অপূর্ণ অবস্থার প্রতি কেন এত আসক্ত?

প্রোফেসর ডরা ঃ এই শরীর একটি যন্ত্রের মতন, যার সাহায্যে আমি অন্যদের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এটা তো কোন পশু বা পাখির পক্ষেও সম্ভব।

প্রোফেসর ডরা ঃ কিন্তু আমাদের কথাবার্তা ও পশু-পক্ষীর কথাবার্তার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কি পার্থক্য? তারা তাদের সমাজে কথাবার্তা বলে এবং আপনি আপনার সমাজে কথাবার্তা বলেন।

প্রোফেসর দুর্কহেইম ঃ আমার বিশ্বাস যে আসল কথা হল যে পশুদের আত্ম-চেতনা নেই। তারা বুঝতে পারে না বাস্তবে তারা কি?

পশুদের ঊর্ধ্বে

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, এটাই আসল কথা। মানুষ বুঝতে পারে সে কে। পশু ও পাখীরা সেটা বুঝতে পারে না। তাই, মানুষ হওয়ার জন্য আমাদের আত্ম সচেতনতার চেষ্টা করতে হবে, সেইসাথে যেন পশু-পক্ষীর স্তরের মতন ব্যবহার না করি। একজন মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে আত্ম-উপলব্ধির চেষ্টা করতে হবে। এইজন্য

বেদান্ত সূত্রের প্রথমেই বলা হয়েছে ঃ *অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা*—পরম সত্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। মানব জীবনের লক্ষ্য এটাই, পশুদের মতন খাওয়া ও ঘুমানো নয়। আমাদের পরম সত্যকে বোঝার জন্য অতিরিক্ত বুদ্ধি রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১.২.১০) বলা হয়েছে—

> *কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।*
> *জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ ॥*

"ইন্দ্রিয় সুখভোগকে কখনই জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। সুস্থ জীবন যাপন করা অথবা আত্মাকে নির্মল রাখার বাসনাই কেবল করা উচিত, কেন না মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। এছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করা উচিত নয়।"

প্রোফেসর ডরা ঃ আমাদের শরীরকে অন্যের উপকারের কাজে লাগানো কি শুধু সময়ের অপচয়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আপনি কখনও অন্যের ভাল করতে পারেন না, কারণ আপনি জানেন না ভাল কি। আপনি শরীরের উন্নতিই ভাল মনে করেন—কিন্তু এই দৃষ্টিকোণ থেকে শরীর মিথ্যা

কিভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হব

শ্রীল প্রভুপাদ : আপনি মনে করেন আপনার স্থিতি আদর্শ নয়। এইজন্য প্রকৃত পন্থা হল কিভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায় তা খুঁজে বের করা।

প্রোফেসর ডরা : কিন্তু আত্মা রূপে আমাদের পূর্ণতা হবার কেন প্রয়োজন? আমরা মানুষ রূপে কেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারি না।

শ্রীল প্রভুপাদ : আপনি পূর্বেই স্বীকার করেছেন যে এই শরীরের মধ্যে আপনার অবস্থান যথাযথ নয়। তাহলে আপনি এই অপূর্ণ অবস্থার প্রতি কেন এত আসক্ত?

প্রোফেসর ডরা : এই শরীর একটি যন্ত্রের মতন, যার সাহায্যে আমি অন্যদের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে পারি

শ্রীল প্রভুপাদ : এটা তো কোন পশু বা পাখির পক্ষেও সম্ভব

প্রোফেসর ডরা : কিন্তু আমাদের কথাবার্তা ও পশু-পক্ষীর কথাবার্তার মধ্যে কিছুর পার্থক্য রয়েছে

শ্রীল প্রভুপাদ : কি পার্থক্য? তারা তাদের সমাজে কথাবার্তা বলে এবং আপনি আপনার সমাজে কথাবার্তা বলেন

প্রোফেসর দুর্কহেইম : আমার বিশ্বাস যে আসল কথা হল যে পশুদের আত্ম-চেতনা নেই। তারা বুঝতে পারে না বাস্তবে তারা কি?

পশুদের ঊর্ধ্বে

শ্রীল প্রভুপাদ : হ্যাঁ, এটাই আসল কথা। মানুষ বুঝতে পারে সে কে। পশু ও পাখীরা সেটা বুঝতে পারে না। তাই, মানুষ হওয়ার জন্য আমাদের আত্ম সচেতনতার চেষ্টা করতে হবে, সেইসাথে যেন পশু পক্ষীর স্তরের মতন ব্যবহার না করি। একজন মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে আত্ম-উপলব্ধির চেষ্টা করতে হবে। এইজন্য

বেদান্ত সূত্রের প্রথমেই বলা হয়েছে : *অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা*—পরম সত্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। মানব জীবনের লক্ষ্য এটাই, পশুদের মতন খাওয়া ও ঘুমানো নয়। আমাদের পরম সত্যকে বোঝার জন্য অতিরিক্ত বুদ্ধি রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১.২.১০) বলা হয়েছে—

> *কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।*
> *জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ॥*

"ইন্দ্রিয় সুখভোগকে কখনই জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। সুস্থ জীবন যাপন করা অথবা আত্মাকে নির্মল রাখার বাসনাই কেবল করা উচিত, কেন না মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। এছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করা উচিত নয়।"

প্রোফেসর ডরা : আমাদের শরীরকে অন্যের উপকারের কাজে লাগানো কি শুধু সময়ের অপচয়?

শ্রীল প্রভুপাদ : আপনি কখনও অন্যের ভাল করতে পারেন না, কারণ আপনি জানেন না ভাল কি। আপনি শরীরের উন্নতিই ভাল মনে করেন—কিন্তু এই দৃষ্টিকোণ থেকে শরীর মিথ্যা

কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ যখন জীবন থেকে মৃত্যুতে গমন করে এবং কিছু রহস্যময় পরিবর্তন ঘটে. ঘটনাচক্রে সেই মুহূর্তে আপনিও উপস্থিত থাকেন

৩

আত্মার বিশ্লেষণ

জীবদেহের জাগতিক কার্যাবলী বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানে বহু গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে. কিন্তু জীবের আধ্যাত্মিক স্ফুলিঙ্গ (spiritual spark) যা জীবের অস্তিত্বের মূল কারণ, সে সম্বন্ধে খুব কমই আলোচনা করা হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানে ১৯৭২ সালে অন্টারিওর উইণ্ডসার শহরে এক বিশিষ্ট সভায় 'মৃত্যুর প্রকৃত ক্ষণ নির্ধারণ করার সম্বন্ধে সমস্যা'—এই বিষয়ের ওপর এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত হার্ট সার্জেন ডাঃ উইলফ্রেড জি বিগেলো অন্টারিওর সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রী এ.ওসার এল হাইনেস এবং উইণ্ডসর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জে ফ্রান্সিস লেডি। ডাঃ বিগেলো আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করেন এবং আবেদন করেন যে, আত্মা কি এবং কোথা থেকে তার উদ্ভব হয়, সেই সম্বন্ধে যেন সুসংবদ্ধ গবেষণা করা হয়। ডাঃ বিগেলো এবং অন্যান্য সদস্যদের এই মন্তব্য পরে 'মন্ট্রিল গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সেই খবরটি যখন শ্রীল প্রভুপাদের গোচরীভূত হয় তখন তিনি আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাকে জানার ব্যবহারিক পন্থা গ্রহণ করবার প্রস্তাব দিয়ে মিঃ বিগেলোকে একটি পত্র লেখেন। মন্ট্রিল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যুত্তরের চিঠিটি নিচে বর্ণনা করা হল :—

মন্ট্রিল পত্রিকার শিরোনাম

হার্ট সার্জেন জানতে চান আত্মা কি

বিশ্ববিখ্যাত কানাডিয়ান হার্ট সার্জেন উইণ্ডসার বলেন যে, তিনি দেহে আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন, যা মৃত্যুর সময় দেহকে ত্যাগ করে চলে যায়। তিনি ঈশ্বরতত্ত্ববিৎদের অনুরোধ করেন যে, তাঁরা যেন সেই সম্বন্ধে আরও ভাল করে জানবার চেষ্টা করেন

টরেন্টো জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিওভ্যাসকুলার শল্য চিকিৎসা বিভাগের প্রধান ডাঃ উইলফ্রেড জি বিগেলো বলেন, "আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসকারী একজন মানুষরূপে" তিনি মনে করেন যে "সেই রহস্য সমাধান করে, তার আসল তত্ত্ব জানার সময় এসেছে"

ডাঃ বিগেলো ছিলেন এসেক্স কাউন্টি মেডিকেল লিগ্যাল সোসাইটির একজন সদস্য এই সোসাইটিতে মৃত্যুর যথার্থ ক্ষণ নির্ধারণ করার সমস্যা বিষয়ে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। কারণ হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টের যুগে যিনি অঙ্গ দান করছেন অর্থাৎ মরণোন্মুখ দাতার দেহের অঙ্গ নেওয়ার প্রকৃত সময় নির্ধারণ করার বিষয়ে এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কানাডা মেডিকেল অ্যাসোশিয়েশন্ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত মৃত্যুর সংজ্ঞা উপস্থাপন করে বলেছেন, "যখন রোগীর চেতনা লোপ পায়, তখন কোন রকম উত্তেজনায় সে সাড়া দেয় না এবং মস্তিষ্কের তরঙ্গ মাপার যন্ত্রটিতে কোন সাড়া পাওয়া যায় না" সেই সভার অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন অন্টারিও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রীএডসন এল হাইনেস এবং উইণ্ডসার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জে ফ্রান্সিস লেডি

আলোচনায় যে সমস্ত বিষয়গুলো ডাঃ বিগেলো উত্থাপন করেছিলেন তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, একজন শল্য চিকিৎসকরূপে তাঁর দীর্ঘ বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় তিনি

নিঃসন্দেহে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন" তিনি বলেন, "আপনারা অনেকেই রোগীর মৃত্যুর সময় সেখানে উপস্থিত থেকেছেন, তখন কিছু রহস্যজনক পরিবর্তন দেখা যায় এর মধ্যে একটি অত্যন্ত লক্ষণীয় পরিবর্তন হল, "হঠাৎ চোখের দীপ্তি নিভে যাওয়া চোখগুলি তখন নিষ্প্রভ হয়ে সম্পূর্ণভাবে নির্জীব হয়ে যায় তবে অন্য যে সব পরিবর্তন দেখা যায়, সেগুলি বর্ণনা বেশ কঠিন. আমার মনে হয় না সেগুলি খুব বিশদভাবে বর্ণনা করা সম্ভব"

এই ডাঃ বিগেলোই, হাইপোথার্মিয়া নামে পরিচিত 'ডিপ ফ্রিজ' শল্য চিকিৎসা পদ্ধতি, এবং হার্ট ভ্যালব্ সার্জারীর জন্য সমগ্র বিশ্ব জুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনিই উক্ত সভায় বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশ্বরতত্ত্ব বিভাগ (থিওলজি) এবং সংশ্লিষ্ট অন্য বিভাগগুলোর 'আত্মার সম্বন্ধে অনুসন্ধান' করা উচিত

এই আলোচনায় লেডি বলেন, 'যদি আত্মা বলে কিছু থাকেও, তাকে আমরা দেখতে পাব না বা তাঁকে আমরা খুঁজে পাব না" "জীবনের জীবনীশক্তির যদি কোনও নীতি থাকে তবে সেটা কি?" সমস্যা হল, "আত্মা কোনও বিশেষ স্থানে ভৌগলিকভাবে অবস্থান করে না তা সর্বব্যাপ্ত এবং সেই সঙ্গে জড় শরীরের কোথাও তাঁর অস্তিত্ব নেই." লেডি আরও বলেন "এই নিয়ে গবেষণা করা হলে ভাল হবে, তবে তা থেকে যে কি পাওয়া যাবে তা আমি জানি না এই প্রসঙ্গে এক রাশিয়ান মহাকাশচারীর কথা মনে পড়ে যায়, যিনি মহাশূন্য থেকে ফিরে আসার পর জানান যে, ভগবান নেই, কারণ তিনি তাঁকে সেখানে দেখতে পাননি

ডাঃ বিগেলো এর উত্তরে বলেন, "হয়তো তাই, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে যখন আমরা এমন কিছুর সম্মুখিন হই. যা বিশ্লেষণ করা যায় না, সেই সম্বন্ধে আমাদের মন্ত্র হচ্ছে, তার উত্তর খুঁজে বের কর" গবেষণাগারে গবেষণা করে অথবা যেভাবেই হোক না কেন সত্যকে আবিষ্কার করতেই হবে"

এখানে মূল প্রশ্ন হল, ডাঃ বিগেলো যেটা বললেন, 'আত্মা কোথায় অবস্থিত এবং কোথা থেকে তা আসে'

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত বেদের প্রামাণিক তথ্য

প্রিয় ডাঃ বিগেলো,

আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন সম্প্রতি গেজেট পত্রিকায় রে কয়েলির লেখা 'হার্ট সার্জেন ওয়ান্টস টু নো হোয়াট এ সোল ইজ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম এবং সেটি আমার কাছে খুবই উৎসাহোদ্দীপক বলে মনে হয়েছে। আপনার মন্তব্য গভীর অন্তর্দৃষ্টিব্যঞ্জক। তাই আমি আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আপনি হয়ত জানেন যে, আমি 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর্ কৃষ্ণ কনশাসনেস' এর প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য। কানাডার মন্ট্রিল, টরেন্টো, ভ্যানকুভার এবং হ্যামিলটনে আমাদের কয়েকটি মন্দির রয়েছে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মার উৎস এবং তার পারমার্থিক স্থিতি সম্বন্ধে সকলকে শিক্ষা দেওয়া।

নিঃসন্দেহে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে আত্মা রয়েছে এবং দেহটিকে সক্রিয় করার সমস্ত শক্তির উৎস হচ্ছে আত্মা আত্মার শক্তি সমস্ত শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত এই শক্তিকে বলে চেতনা যেহেতু আত্মার এই চেতনা সমস্ত শরীর জুড়ে বিস্তৃত, তাই শরীরের যেকোনও অংশেই আমরা বেদনা ও আরাম অনুভব করি। আত্মা হল স্বতন্ত্র এবং সে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয় ঠিক যেমন একটি মানুষ শৈশব থেকে বাল্যে বাল্য থেকে কৈশোরে কৈশোর থেকে যৌবনে এবং অবশেষে বার্ধক্যে দেহান্তরিত হয় তারপর মৃত্যু নামক একটি পরিবর্তন ঘটে, যখন পুরোন শরীরটি ছেড়ে একটি নতুন শরীর গ্রহণ করা হয়, ঠিক যেমন আমরা পুরোন পোষাক ছেড়ে নতুন পোষাক পড়ি। একে বলে আত্মার দেহান্তর

আত্মা যখন চিজ্জগতে তার প্রকৃত ধামের কথা ভুলে গিয়ে এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, তখন তাকে কঠোর জীবন সংগ্রামে ব্রতী হতে হয় জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধিময় এই কৃত্রিম জীবনের অবসান সম্ভব ভগবানের পরম চৈতন্যের সঙ্গে আমাদের চেতনাকে যুক্ত করার মাধ্যমে আর এটিই কৃষ্ণভাবনামৃতের মূল উদ্দেশ্য

হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ হার্টে যদি আত্মা না থাকে তবে তার ট্রান্সপ্ল্যানটেশন অর্থাৎ এক দেহ থেকে আরেক দেহে সংযোজন সম্ভব নয় তাই আত্মার উপস্থিতি স্বীকার করতেই হবে যদি আত্মা না থাকে, তবে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যৌন সঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও গর্ভসঞ্চার হয় না গর্ভনিরোধক প্রক্রিয়ায় গর্ভের পরিস্থিতি এমন করা হয় যে সেখানে আত্মা অবস্থান করতে পারে না। এটি ভগবানের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ কারণ ভগবান একটি আত্মাকে একটি নির্দিষ্ট গর্ভের জন্য পাঠান কিন্তু গর্ভনিরোধক ব্যবস্থায় সে সেখানে প্রবেশ করতে না পেরে অন্য গর্ভে প্রবেশ করে। ঠিক যেমন, কোনও একজনকে একটি বিশেষ বাড়িতে

বাস করতে দেওয়া হল, কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতি যদি এমন করা হয়, যে সে সেই বাড়িটিতে প্রবেশ করতে না পারে, তাহলে তাকে প্রবল অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়। তাই গর্ভনিরোধন বেআইনি এবং যারা সেটি করেন তাদের অবশ্যই দণ্ড ভোগ করতে হয়।

'আত্মার বিশ্লেষণ' যদি করা হয়, তবে তাতে অবশ্যই বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হবে। তবে জড় বিজ্ঞানের অগ্রগতির মাধ্যমে কখনই আত্মাকে বোঝা যাবে না। আত্মার উপস্থিতি কেবল উপলব্ধির মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব। বৈদিক শাস্ত্রে আপনি দেখবেন, আত্মার আয়তন বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, তা একটি বিন্দুর দশ সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র। জড় বৈজ্ঞানিকরা একটি বিন্দুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যেখানে মাপতে পারে না, সেখানে জড় বিজ্ঞানের মাধ্যমে আত্মাকে জানা অসম্ভব। প্রামাণিক সূত্র থেকে জ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে আত্মার অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সমস্ত বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা এখন যা আবিষ্কার করছে আমরা বহু পূর্বে তা বিশ্লেষণ করেছি।

যখন কেউ আত্মার অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তখনই সে ভগবানের অস্তিত্বও উপলব্ধি করতে পারবে। ভগবান ও জীবাত্মার মধ্যে পার্থক্য হল যে, ভগবান হলেন পরম আত্মা এবং জীবাত্মা হল অনুসদৃশ আত্মা, কিন্তু গুণগতভাবে উভয়ই এক। ভগবান সর্বব্যাপ্ত, সেখানে জীব হল সীমিত। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে এবং গুণগতভাবে তারা একই রকম।

আপনার মূল প্রশ্নটি হল, "আত্মা কোথায় অবস্থান করে এবং কোথা থেকে আসে?" এর উত্তর বোঝা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, আত্মা জীবের হৃদয়ে কীভাবে অবস্থান করছে এবং কীভাবে মৃত্যুর পর সে অন্য একটি দেহে দেহান্তরিত হচ্ছে? প্রকৃতপক্ষে আত্মার উৎস হলেন স্বয়ং ভগবান। ঠিক যেমন একটি স্ফুলিঙ্গের উৎস হল অগ্নি। স্ফুলিঙ্গটি যখন অগ্নি থেকে বিচ্যুত

হয় তখন মনে হয় সেটি নিভে গেছে। চিৎ স্ফুলিঙ্গ আত্মা চিৎ জগৎ থেকে জড় জগতে পতিত হয়। জড় জগতে জীবাত্মা তিনটি বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয়, যেগুলিকে বলা হয় প্রকৃতির গুণ। একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ যখন শুষ্ক ঘাসের উপর পড়ে তখন তার দহনশক্তি প্রকাশ পায় না, আবার সেই স্ফুলিঙ্গটি যদি জলে পড়ে তবে তক্ষুণি সেটি নিভে যায়। একইভাবে আমরা দেখতে পাই জীবাত্মা তিন প্রকার অবস্থায় জন্ম নেয়। একধরনের জীব তাঁর চিন্ময় স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়, আরেক প্রকার জীব তার চিন্ময় স্বরূপ প্রায় বিস্মৃত হলেও তার চিন্ময় প্রকৃতি সম্বন্ধে সহজাত প্রেরণা রয়েছে, আর অন্য স্তরের জীব সম্পূর্ণরূপে তার চিন্ময় পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার অন্বেষণ করছে। চিৎ-স্ফুলিঙ্গ আত্মার চিন্ময় পূর্ণতা লাভ করার এক যথার্থ পন্থা রয়েছে এবং সে যখন যথাযথভাবে পরিচালিত হয়, তখন সে অনায়াসে তার নিত্য আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারে, সেই যেখান থেকে সে এখানে অধঃপতিত হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে যদি আজকের মানব-জাতিকে এই প্রামাণিক বৈদিক তথ্য প্রদান করা যায়, তা হলে মানব-সমাজের এক বিশেষ কল্যাণ সাধিত হবে। আত্মা সম্বন্ধীয় সকল তথ্যই বেদে দেওয়া আছে। সেগুলিকে কেবলমাত্র আধুনিক ভাবধারার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে দেশের ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকদের এগিয়ে আসতে হবে। তাদের মাধ্যমেই যদি সাধারণ মানুষ আত্মার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপলব্ধি করতে পারে তবেই মানব সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে।

শুভ কামনা সহ

এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী

এই জড় জগতে সকল মানুষই কোন না কোন সময়ে আত্মীয় স্বজন ও শত্রু হয়ে ওঠে। কিন্তু এই বিভিন্ন রূপান্তরের জন্য কেউই চিরকালের জন্য সম্পর্কিত নয়।

১

যে রাজপুত্রের লক্ষ মা ছিল

"কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যবৎ দর্শন করেন, কেউ আশ্চর্যভাবে বর্ণনা করেন এবং কেউ আশ্চর্য জ্ঞানে শ্রবণ করেন, আর কেউ শুনেও তাকে বুঝতে পারেন না।"

—ভগবদ্‌গীতা ২/২৯

সুবিখ্যাত ব্রিটিশ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর বিখ্যাত পদ্য 'ইনটিমেশন অব ইমমরটালিটিতে' লিখেছেন, আমাদের জন্ম নিতান্তই এক নিদ্রা এবং এক প্রকার বিস্মৃতি। অন্য আরেকটি কবিতায় একটি শিশুর উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নরূপ কয়েকটি লাইন লিখেছিলেন—

ওহে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে তুমি মধুর নবাগত,
জেনো, এক অন্ধকারময় প্রষ্ঠা দৃঢ়রূপে রয়েছে অনুমানরত;
একদিন তুমি ছিলে এখানেই, এই মনুষ্য জন্মেই,
ছিলে পূর্বেও মনুষ্য পিতা ও মাতার আশীর্বাদেই,
দীর্ঘ, দীর্ঘ অতীতেও তোমার উপস্থিতি ছিল মাতৃ আলিঙ্গিত,
ওহে অসহায় অতিথি, তুমি ছিলে বারবার মাতৃ-স্তনে লালিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক উপাখ্যানে রাজা চিত্রকেতুর পুত্র তার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিল এবং সে তার মাতা পিতা অর্থাৎ রাজা রাণীকে আত্মার অবিনশ্বর রূপ সম্বন্ধে এবং পুনর্জন্মের বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়।

পুরাকালে মহারাজ চিত্রকেতুর অনেক পত্নী ছিল। তিনি নিজে সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হলেও দুর্ভাগ্যবশত পত্নীদের থেকে তিনি একটি সন্তানও লাভ করতে পারেননি দৈবযোগে মহারাজ চিত্রকেতুর সব পত্নীই বন্ধ্যা ছিলেন

সন্তান না হওয়ায় মহারাজ খুব মনোকষ্টে ছিলেন। এরকম সময়ে একদিন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী মহর্ষি অঙ্গিরা চিত্রকেতুর প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন। ঋষিকে দেখামাত্রই চিত্রকেতু সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। বৈদিক রীতি অনুযায়ী তিনি সেই মহান অতিথির সৎকার করলেন।

মহর্ষি অঙ্গিরা বললেন, "হে মহারাজ চিত্রকেতু, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার মন প্রসন্ন নয়। তোমার বিবর্ণ মুখমণ্ডলেই তোমার গভীর উদ্বিগ্নতা প্রতিফলিত হচ্ছে। তোমার মনোবাসনা কি পূর্ণ হয়নি?"

বাস্তবিকপক্ষে মহর্ষি অঙ্গিরা ছিলেন একজন মহান ঋষি। অঙ্গিরা জানতেন মহারাজ চিত্রকেতুর দুঃশ্চিন্তার কারণটি কি। কিন্তু তবুও তিনি চিত্রকেতুকে এমনভাবে প্রশ্নগুলো করেছিলেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না।

মহারাজ চিত্রকেতু উত্তরে বললেন, "হে মহর্ষি অঙ্গিরা, তপস্যা কৃচ্ছ্রসাধন ও কঠোরতার মাধ্যমে আপনি সমস্ত জ্ঞানই অর্জন করেছেন। তাই আপনার মতন একজন সিদ্ধযোগী আমার মতন একজন বদ্ধজীবের অন্তরের ও বাইরের সব কথাই জানেন। হে মহাত্মন, আপনি যদিও সব কিছু জানেন, তবুও আপনি আমার দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনার আদেশ অনুসারে আমি তা বিশ্লেষণ করছি। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তিকে মালা অথবা চন্দন আদি সুখপ্রদ বিষয় সুখ দিতে পারে না। সেরকমই, বিশাল সাম্রাজ্য এবং অপরিমেয় ঐশ্বর্যের কোন মূল্যই আমার কাছে নেই। কারণ আমি একজন মানুষের প্রকৃত সম্পদ থেকে বঞ্চিত। আমি অপুত্রক। হে মহর্ষি, যাতে আমি প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারি, তার জন্য কি পুত্র লাভের উপায় বলে দিতে পারেন?"

মহর্ষি অঙ্গিরা ছিলেন খুবই কৃপালু। তিনি মহারাজ চিত্রকেতুকে সাহায্য করতে সম্মত হলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিশেষ যজ্ঞ

করলেন এবং সেই যজ্ঞে নিবেদিত পায়েস মহারাজ চিত্রকেতুর শ্রেষ্ঠা রাণী কৃতদ্যুতিকে খেতে দিলেন। ঋষি অঙ্গিরা বললেন, "হে রাজন এখন তুমি একটি পুত্র লাভ করবে যে তোমার হর্ষ ও শোক উভয়েরই কারণ হবে।" এই কথা বলেই চিত্রকেতুর উত্তরের অপেক্ষা না করে ঋষি প্রস্থান করলেন।

অবশেষে যে তিনি পুত্রসন্তানের পিতা হতে চলেছেন, একথা শুনে মহারাজ চিত্রকেতু খুবই আনন্দিত হলেন, তবে একই সাথে ঋষির শেষের কথাগুলো শুনে আশ্চর্যও হলেন। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন—"ঋষি অঙ্গিরা এই কথাই বললেন যে পুত্র জন্মালে আমি খুবই খুশী হব, এটা একদম সত্যি কথা। কিন্তু এই শিশুই আমার দুঃখের কারণ হবে, এই কথা বলে ঋষি কি বোঝাতে চাইলেন? অবশ্যই এই শিশু আমার একমাত্র পুত্র হওয়ায়, সেই-ই আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারি হবে। সেইজন্য ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের গর্বে গর্বিত হয়ে সে হয়তো অবাধ্য হবে। সেটাই হতে পারে আমার দুঃখের কারণ। কিন্তু পুত্র না থাকার চেয়ে অবাধ্য পুত্র থাকাও অনেক ভাল।" ঋষি অঙ্গিরার কথায় রাজা প্রথমে আশ্চর্য হলেও এইরকম মনে করে নিজের মনকে প্রসন্ন করলেন।

যথাসময়ে রাণী কৃতদ্যুতি গর্ভবতী হলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মাল। রাজার পুত্রলাভের সংবাদে রাজ্যবাসীরা সকলেই খুব আনন্দিত হলেন। রাজা চিত্রকেতুও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

এদিকে পুত্রসন্তান লাভ হওয়ায় রাণী কৃতদ্যুতির প্রতিও মহারাজ চিত্রকেতুর স্নেহ ক্রমশ বাড়তে লাগল। পাশাপাশি অন্যান্য পত্নীদের সন্তান না থাকায় তাদের প্রতিও মহারাজের স্নেহ কমতে লাগল। রাজা তাদের উপেক্ষা করতেন। তারা মনে মনে কষ্ট পেতেন এবং নিজেদের ভাগ্যকে ধিক্কার জানাতেন। কারণ যেসব পত্নীর পুত্রসন্তান থাকে না,

সেইসব স্ত্রীকে পতি অনাদর করে এবং সপত্নীরাও তাকে দাসীর মতন অসম্মান করে। এইজন্য মহারাজ চিত্রকেতুর অন্যান্য পুত্রহীন পত্নীরা উপেক্ষিত হয়ে ক্রোধে ও ঈর্ষায় দগ্ধ হতে লাগলেন। ক্রমশ বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়ে তাদের বুদ্ধি নষ্ট হল। তাদের হৃদয় হয়ে উঠল পাথরের মতন কঠিন। তারা গোপনে মিলিত হয়ে আলোচনা করে ঠিক করল যে রাজার ভালবাসা ফিরে পাওয়ার একটিই উপায়, তা হল কুমারকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা।

একদিন দুপুরে মহারাণী কৃতদ্যুতি প্রাসাদের বাগানে ঘুরছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, তার শিশুপুত্রটি বুঝি গভীর ঘুমে রয়েছে। তিনি সন্তানকে এতই ভালবাসতেন যে এক মুহূর্তের জন্যও তাকে দৃষ্টির বাইরে রাখতেন না, তাই তিনি ধাত্রীকে আদেশ করলেন, শিশুটিকে জাগিয়ে বাগানে নিয়ে আসার জন্য।

ধাত্রীটি শুয়ে থাকা বালকটিকে ঘুম থেকে তুলতে গিয়ে দেখল যে তার চোখ দুটি ওপরে উঠে গেছে এবং তার দেহে প্রাণের কোনও লক্ষণই নেই। ভয় পেয়ে সে তাড়াতাড়ি একটুকরো শুকনো তুলো বালকটির নাকের কাছে রাখল। কিন্তু তুলোটা একটুকুও সরল না। এই দেখে সে আর্তনাদ করে উঠল—'হায়, আমার সর্বনাশ হয়েছে।' আর্তনাদ করেই ধাত্রী মাটিতে পড়ে গেল। সেইসাথে ব্যাকুলভাবে দুই হাত দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে জোরে চিৎকার করতে লাগল।

এদিকে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হওয়াতে রাণী কৃতদ্যুতিও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শিশুটি যেই ঘরে ঘুমিয়েছিল উদ্বিগ্ন রাণী সেইখানে এলেন। ধাত্রীর চিৎকার শুনে তিনি ঘরে এসে পুত্রকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেলেন। গভীর শোকে রাণীর কেশ ও বস্ত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল এবং তিনি মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন।

মহারাজ চিত্রকেতু যখন তাঁর পুত্রের হঠাৎ মৃত্যুর খবর পেলেন, তখন তিনি শোকে প্রায় অন্ধ হয়ে গেলেন। পুত্রের প্রতি গভীর স্নেহে

তার শোক আগুনের মতন বাড়তে লাগল। মৃত পুত্রকে দেখতে যাওয়ার সময় তিনি বারবার হোঁচট খেয়ে পড়তে লাগলেন। মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজকর্মচারী এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তিনি রুক্ষ কেশ ও বিক্ষিপ্ত বসনে মৃত বালকের পায়ের তলায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে পাবার পর রাজা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। তিনি কিছুই বলতে পারছিলেন না।

এদিকে মহারাণী কৃতদ্যুতি যখন দেখলেন যে তার স্বামী দারুণভাবে শোকগ্রস্ত হয়ে রয়েছেন, সেইসাথে পাশেই মৃত পুত্রকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি বিধাতাকে দোষারোপ করতে লাগলেন। এই দেখে উপস্থিত অন্যান্যদেরও শোক বাড়তে লাগল। রাণীর উন্মুক্তকেশ থেকে মালাগুলো খুলে পড়েছিল। চোখের জল কাজলকে মুছে দিয়েছিল।

"হে বিধাতা, পিতার জীবিত অবস্থায় তুমি পুত্রের মৃত্যুর কারণ হয়ে নিজ সৃষ্টির নিয়মের বিপরীত কার্য করেছ। তুমি সকল জীবের শত্রু এবং কখনই তাদের প্রতি কৃপালু নও।" আবার মৃত পুত্রটির দিকে তাকিয়ে রাণী বলতে লাগলেন, 'হে পুত্র, আমি অসহায় এবং অত্যন্ত কাতর। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। তোমার শোকসন্তপ্ত পিতাকে দেখ। তুমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ। এখন ওঠ। তোমার খেলার সাথীরা তোমাকে খেলতে ডাকছে। তুমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। উঠে আহার কর। হে প্রিয় পুত্র, আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা, কারণ আমি আর তোমার সুন্দর মুখের মধুর হাসি দেখতে পাব না। তোমার চোখ দুটি চিরকালের মতন বন্ধ করেছ। তোমাকে সেই স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেখান থেকে তুমি আর ফিরে আসবে না। হে প্রিয় পুত্র তোমার মধুর বাক্য না শুনতে পারলে আমিও বেশীদিন বাঁচব না।"

মহারাজ চিত্রকেতুও জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। এইভাবে রাজা ও রাণীকে কাঁদতে দেখে তাদের অনুগত উপস্থিত সকলেই কাঁদতে লাগলেন। কারণ শিশুটির আকস্মিক মৃত্যুতে সমস্ত নগরবাসীই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল

যখন মহর্ষি অঙ্গিরা বুঝতে পারলেন যে রাজা শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়ে মৃতপ্রায় হয়েছেন, তখন তিনি বন্ধু নারদ মুনিকে সঙ্গে করে সেখানে গেলেন।

দুই ঋষি সেখানে পৌঁছে দেখলেন, শোকে মুহ্যমান রাজা পুত্রের মৃতদেহের পাশে আর একটি মৃতদেহের মতন পড়ে আছেন ঋষি অঙ্গিরা তীক্ষ্ণভাবে রাজাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জাগো হে রাজা, এই মৃতদেহের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক এবং তোমার সাথেই বা এই মৃতপুত্রের কি সম্পর্ক? তুমি বলতে পারো, যে তুমি তাঁর পিতা এবং সে তোমার পুত্র কিন্তু তুমি কি মনে কর তোমাদের এই সম্পর্ক পূর্বে ছিল? এখনও কি রয়েছে? ভবিষ্যতে কি তা থাকবে? হে রাজন স্রোতের বেগে বালুকারাশি কখনও একত্রিত হয় আবার কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তেমনই কালের প্রভাবে জড় দেহধারী জীবদের কখনও মিলন হয় এবং কখনও বিচ্ছেদ হয়।" এইভাবে ঋষি অঙ্গিরা রাজাকে বোঝাতে চাইলেন যে জড় দেহের সম্পর্ক সর্বদাই অনিত্য।

মহর্ষি অঙ্গিরা বলতে লাগলেন, "হে রাজা, যখন পূর্বে আমি তোমার প্রাসাদে এসেছিলাম, তখনই আমি তোমাকে সবচেয়ে দামী উপহার দিব্যজ্ঞান দান করতাম। কিন্তু যখন আমি দেখলাম তোমার মন জাগতিক বিষয়ে আসক্ত রয়েছে, তাই আমি তোমাকে কেবলমাত্র একটি পুত্র প্রদান করেছিলাম যে তোমার হর্ষ ও বিষাদের কারণ হয়েছে এখন তুমি পুত্রবানদের দুঃখ অনুভব করছ। এই স্ত্রী, সন্তান, ধন, ঐশ্বর্য এবং অন্যান্য সবকিছু স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয় অতএব

হে রাজা চিত্রকেতু, জানার চেষ্টা কর তুমি প্রকৃতপক্ষে কে? বিচার করে দেখ তুমি কোথা থেকে এসেছ এবং এই দেহ ত্যাগ করার পর তুমি কোথায় যাবে এবং কেন তুমি জড় শোকের বশীভূত হয়েছ?

তখন নারদমুনি কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন যোগবলে তিনি রাজার মৃত পুত্রের আত্মাকে সকলের দৃষ্টিগোচরে আনলেন নিমেষে ঘরটি উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উপস্থিত সকলের চোখ ধাঁধিয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুপুত্রের মৃতদেহটি নড়ে উঠল নারদ মুনি বললেন "হে জীবাত্মা, তোমার মঙ্গল হোক তোমার পিতামাতাকে দর্শন কর তোমার সকল বন্ধু ও আত্মীয়েরা তোমার মৃত্যুতে শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে রয়েছেন যেহেতু তোমার অকালমৃত্যু হয়েছে তাই তোমার আয়ু এখনও অবশিষ্ট আছে। অতএব তুমি পুনরায় তোমার দেহে প্রবেশ করে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল ভোগ কর তোমার পিতৃপ্রদত্ত রাজসিংহাসন ও সমস্ত ঐশ্বর্য গ্রহণ কর "

নারদমুনির অলৌকিক শক্তিতে জীবাত্মাটি বালকটির মৃতদেহে পুনরায় প্রবেশ করল যে বালকটি মারা গিয়েছিল সে উঠে বসল এবং একটি জ্ঞানী ব্যক্তির মতন কথা বলতে লাগল সে বলল, 'আমি আমার কর্মের ফলে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হচ্ছি কখনও দেবযোনিতে, কখনও নিম্নস্তরের পশুযোনিতে, কখনও বৃক্ষলতারূপে আবার কখনও মনুষ্য যোনীতে ভ্রমণ করছি সুতরাং কোন জন্মে এরা আমার মাতা-পিতা ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে কেউ-ই আমার মাতা-পিতা নন। সেখানে আমি কি করে এই দুই ব্যক্তিকে আমার পিতা মাতারূপে গ্রহণ করতে পারি?"

বেদে বলা হয়েছে যে জীবাত্মা জড় উপাদানে গঠিত একটি দেহে প্রবেশ করে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জীবাত্মাটি মহারাজ চিত্রকেতু এবং রাণী কৃতদ্যুতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, সে কিন্তু তাদের সন্তান নয়। কারণ জীবাত্মা স্বয়ং ভগবানের সন্তান যেহেতু সে জড় জগতকে ভোগ করতে চায়, তাই ভগবান তাকে বিভিন্ন জড় শরীরে প্রবেশ করার মাধ্যমে তার সেই বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ দিয়েছেন তাই জড় দেহের পিতা-মাতার কাছ থেকে জীবাত্মা জড় দেহ লাভ করলেও তাদের সঙ্গে জীবাত্মাটির বাস্তবিকই কোনও সম্পর্ক নেই। সেজন্য এক্ষেত্রে জীবাত্মাটি মহারাজ চিত্রকেতু ও তাঁর পত্নীকে তার পিতা-মাতা রূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে

জীবাত্মাটি বলতে লাগল, "সমস্ত জীবদের নিয়ে নদীর মতন প্রবাহমান এই জড় জগতে সকলেই কালের প্রভাবে পরস্পরের বন্ধু, আত্মীয়, শত্রু, আদি বহু সম্পর্কে সম্পর্কিত হয় এই সকল সম্পর্ক সত্ত্বেও কেউই প্রকৃতপক্ষে কারও সঙ্গে নিত্য সম্পর্কে সম্পর্কিত নয় "

মহারাজ চিত্রকেতু এখানে তার মৃতপুত্রের জন্য শোক করছিলেন, কিন্তু তিনি এই পরিস্থিতিটিকে অন্যভাবেও বিচার করতে পারতেন। তিনি ভাবতে পারতেন "এই জীবাত্মাটি পূর্ব জীবনে আমার শত্রু ছিল, এখন আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে আমাকে আরও দুঃখ দেওয়ার জন্য অকালে প্রাণত্যাগ করেছে।"

চিত্রকেতুর শিশুপুত্রের অভ্যন্তরে জীবাত্মাটি বলল, "স্বর্ণ এবং অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তু যেমন একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে স্থানান্তরিত হয়, তেমনই জীব তার কর্মফলের প্রভাবে একের পর এক বিভিন্ন প্রকার পিতার দ্বারা বিভিন্ন যোনিতে সঞ্চারিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিভ্রমণ করছে।"

ভগবদ্গীতায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, কোনও পিতা-মাতা থেকে কোনও জীবের জন্ম হয় না। জীব তথাকথিত পিতা মাতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা প্রকৃতির নিয়মে জীব কোনও পিতার বীর্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয় সেখান থেকে মাতার গর্ভে প্রবেশ

করে পিতা-মাতা মনোনয়নের ব্যাপারে তাঁর কোনও ভূমিকা থাকে না। কাদের সন্তানরূপে সে জন্মাবে তার ভাগ্য কি হবে তা তার পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

জীবাত্মা কখনও কখনও পশু পিতা-মাতার সন্তান রূপে আবার কখনও মানুষ পিতা-মাতার সন্তানরূপে আশ্রয় নেয় আবার কখনও পক্ষী শাবকরূপে কখনও বা দেবশিশুরূপেও জন্মাতে পারে এইভাবে মানুষ, পশু, বৃক্ষ, দেবতা সহ বিভিন্ন যোনিতে দেহান্তরিত হতে হতে আত্মা বিভিন্ন পিতা-মাতা পায় মনুষ্য জন্মের কর্তব্য হল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের সন্ধান করা। কারণ এর তত্ত্বাবধানেই সে এই পুনরাবর্তনের চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে আর এই সদ্গুরুর সন্ধান পাওয়াই সবচেয়ে কঠিন কাজ

শুদ্ধ আত্মাটি বলল, "জীবাত্মা নিত্য তথাকথিত পিতা-মাতার সঙ্গে তার প্রকৃতই কোনও সম্পর্ক নেই সে ভ্রান্তভাবে নিজেকে সেই পিতা-মাতার পুত্র বলে মনে করে তাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করে যদিও মৃত্যুর পর এই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তাই এই সাময়িক সম্পর্কের ভিত্তিতে ভ্রান্তভাবে হর্ষ ও বিষাদে জড়িয়ে পড়া উচিত নয় জীব নিত্য এবং অবিনশ্বর, কারণ তার আদি এবং অন্ত নেই। তার কখনও জন্ম ও মৃত্যু হয় না গুণগতভাবে জীব শ্রীভগবানের সমান কিন্তু যেহেতু সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই সে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা মোহিত হতে পারে এবং তার ফলে সে বাসনা অনুসারে নিজের জন্য বিভিন্ন প্রকার দেহ সৃষ্টি করে

বেদে বলা হয়েছে যে, এই জড় জগতে জীব তার বদ্ধ জীবনের জন্য দায়ী এখানে সে পুনর্জন্মের আবর্তে আবদ্ধ থেকে এক দেহ থেকে আরেক দেহে পরিভ্রমণ করে। যদি সে চায় তবে সে জড় জগতে বারংবার কারারুদ্ধ হবার জন্য আসতে পারে আবার ইচ্ছে করলে সে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামেও ফিরে যেতে পারে। যদিও

ভগবান জাগতিক শক্তির মাধ্যমে জীবাত্মাকে তার বাসনা অনুযায়ী জড় দেহ দান করেন, কিন্তু স্বয়ং ভগবানেরও প্রকৃত ইচ্ছা এই যে বদ্ধজীব এই শাস্তিময় পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পেয়ে যেন তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যায়

এত কিছু বলার পর হঠাৎই বালকটি নিস্তব্ধ হয়ে গেল, কারণ জীবাত্মা বালকের দেহটি ছেড়ে চলে গেল এবং দেহটি প্রাণহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে রইল এই দেখে চিত্রকেতু এবং উপস্থিত তার সকল আত্মীয় ও বন্ধুস্বজনরা অবাক হলেন কিন্তু তারা সবাই তখন স্নেহরূপ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে শোক কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তারা মৃত বালকটির দেহ সৎকার করলেন মহারাণী কৃতদ্যুতির সপত্নী, যারা শিশুটিকে বিষ দিয়েছিল তারা অত্যন্ত লজ্জিত হল তারা ঋষি অঙ্গিরার উপদেশ স্মরণ করে আর পুত্র কামনা করলেন না। সেইসাথে ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে যমুনার জলে স্নান করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত ঘটনায় রাজা চিত্রকেতু ও তার পত্নীরা পুনর্জন্মের বিজ্ঞানসহ আধ্যাত্মিক জ্ঞান পুরোপুরি লাভ করতে পেরেছিলেন, যার ফলে তারা সমস্ত প্রকার স্নেহ, যার থেকেই দুঃখ, বেদনা ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তা পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন যদিও জাগতিক জীবনে যেকোনও প্রকার আত্মীয় বন্ধন কাটিয়ে ওঠা খুবই কষ্টকর কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান পুরাপুরি আহরণ করেই রাজা কৃতদ্যুতির পরিবার সমস্ত মায়া কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল

"যেহেতু এই হরিণটি আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, আমি কি করে একে উপেক্ষা করতে পারি? যদিও তা আমার আধ্যাত্মিক জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, কিন্তু আমি একে উপেক্ষা করতে পারি না।"

২

স্নেহের শিকার

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন। —ভগবদ্গীতা ২/২২

প্রথম শতাব্দীতে রোমান কবি ওভিড নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখেছিলেন। যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল এক অভাগা মানুষের পুর্নজন্মের কাহিনী। যাকে নিজের কর্ম ও বাসনার জন্য ক্রমবিবর্তনের পথে কয়েকটি ধাপ নেমে যেতে হয়েছিল।

তোমাকে আমার বলতে লজ্জা করছে
কিন্তু আমি বলবই—
শুকরের রুক্ষ শক্ত লোম আমার মধ্যে গজিয়ে উঠেছিল।
আমি কথা বলতে পারতাম না; কথার পরিবর্তে
কেবলই ঘোঁত ঘোঁত শব্দ বেরিয়ে আসতো।
আমি অনুভব করতাম, আমার মুখ কঠিনভাবে বর্দ্ধিত হচ্ছে
আমার এই নাকের বদলে ছিল শুকরের প্রলম্বিত নাক,
আর ভূমি দেখবার জন্য
আমার মুখকে ঝুঁকে পড়তে হোত
মাংসল পেশীতে ফুলে উঠেছিল আমার ঘাড়;
আর যে হাত, এখন আমার ঠোঁটে কাপ তুলে ধরছে
সেটি তখন ভূমিতে পদছাপ অঙ্কিত করত।
—মেটামোরফোসেস্

ওভিডের সময়ের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে লেখা হয়েছিল শ্রীমদ্ভাগবত। যেখানে একটি কাহিনীতে পুনর্জন্মের নীতিকে কর্মের মাধ্যমে নাটকীয়ভাবে বোঝানো হয়েছে. কাহিনীটিতে বলা হয়েছে ভারতবর্ষের মহান ধার্মিক রাজা ভরতকে কিভাবে একটি হরিণ শাবকের প্রতি স্নেহের জন্য পুনরায় মানব দেহ লাভের পূর্বে হরিণ রূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল।

পুরাকালে রাজা ভরত ছিলেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি. তিনি একসময় ভাবতেন যে একশ বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর চেতনা সমৃদ্ধ হয়। তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিদের নির্দেশকে পালন করেন প্রাচীন ঋষিরা বলতেন যে শেষ জীবনে প্রত্যেকেরই আত্ম-উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত রাজা ভরত এই নির্দেশকে শিরোধার্য করে যৌবন কাল সমাপ্তে রাণী, পুত্র, পরিবার, ঐশ্বর্য্য সহ সবকিছু পরিত্যাগ করে বনে চলে যান।

প্রকৃতপক্ষে রাজা ভরত ছিলেন মহাজ্ঞানী তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর এই ঐশ্বর্য ও সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী নয়। তাই আমৃত্যু তিনি রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে থাকতে চাননি তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, একজন রাজার শরীরও শেষ পর্যন্ত ধুলো বা ছাই-এ পরিণত হয় অথবা পশু ও পোকামাকড়ের খাদ্যে পরিণত হয় কিন্তু এই অনিত্য দেহের মধ্যেই রয়েছে অবিনশ্বর আত্মা। সেটিই হল প্রকৃত সত্তা। যোগাভ্যাসের মাধ্যমেই মানুষ নিজের এই প্রকৃত আধ্যাত্মিক পরিচয়কে উপলব্ধি করতে পারে। এইভাবে একবার আত্ম-উপলব্ধি ঘটলে সেই জীবাত্মাকে পুনরায় কোন শরীরের মধ্যে আবদ্ধ হতে হয় না।

প্রকৃতপক্ষে পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পাওয়াই হল মনুষ্যজীবনের মূল উদ্দেশ্য। মহারাজ ভরত এই উদ্দেশ্যকেই যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাই তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করে হিমালয়ের

পাদদেশে পবিত্র পুলহাশ্রমে চলে যান। সেখানে গণ্ডকী নদীর তীরে তিনি একাকী বাস করতে লাগলেন সেই স্থানে জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাতে গিয়ে রাজা ভরত নিজের জীবনযাত্রারও আমূল পরিবর্তন করেন রাজকীয় পোষাকের পরিবর্তে মৃগচর্মের বসন পরতেন। এমনকি ক্ষৌরকার্যও করতেন না ফলে তাঁর চুল এবং দাড়ি ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ত্রিসন্ধ্যা স্নানের জন্য তাঁর জটা ও দাড়ি সবসময়ই সিক্ত থাকত

পুলহাশ্রমে রাজা ভরতের দিনযাপন ছিল নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা প্রতিদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি বাক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করতেন এবং নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতেন "পরমেশ্বর ভগবান শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেন এবং ভক্তদের সকল বাসনা পূর্ণ করেন। ভগবান তাঁর চিৎ শক্তির দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের বাসনা অনুসারে পরমাত্মারূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছেন এবং বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী সমস্ত জীবদের পালন করেন বুদ্ধিবৃত্তি প্রদানকারি সেই ভগবানকেই আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

দিনের বাকি সময়টাতে রাজা ভরত বৈদিক শাস্ত্র মেনে বিভিন্ন ফলমূল সংগ্রহ করতেন। সেই সামান্য ফল-মূলই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে পরে প্রসাদরূপে গ্রহণ করতেন পুলহাশ্রমে তাঁর দিনযাপন ছিল অত্যন্ত সরল, যদিও জীবনের একটা সময় তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসের মধ্যে দিন কাটিয়েছিলেন কিন্তু পুলহাশ্রমে তিনি কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে যাবতীয় জড় জাগতিক কামনাকে জয় করতে পেরেছিলেন এইভাবেই জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তন চক্রের মূল কারণ জড় জাগতিক বন্ধন থেকে রাজা ভরত নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন।

পুলহাশ্রমে ক্রমাগত পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার মাধ্যমে রাজা ভরত আধ্যাত্মিক আনন্দের আস্বাদ পেতে লাগলেন তাঁর হৃদয় যেন আধ্যাত্মিক আনন্দে পূর্ণ একটি সরোবর হয়ে উঠল তাঁর মন যখন সেই সরোবরে অবগাহন করত তখন তাঁর দুই চোখ দিয়ে আনন্দ অশ্রু বইত

কিন্তু এরই মাঝে একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা ঘটল। যার প্রভাব দারুণভাবে পড়েছিল ভরতের জীবনের ওপর। সেদিন নদীর তীরে বসে রাজা ভরত ধ্যান করছিলেন এমন সময় একটি হরিণী সেই নদীতে জল খেতে আসে হরিণীটি ছিল সন্তানসম্ভবা। সে যখন জল খাচ্ছিল তখন কাছাকাছি কোথাও একটি সিংহ গর্জন করে উঠল গর্জন শুনে প্রাণভয়ে ভীত হরিণীটি ঝাঁপ দেয় আর তখনই তাঁর প্রসব হয়ে একটি ছোট্ট হরিণ শাবকের জন্ম হয় সদ্যোজাত শাবকটি স্রোতের জলে পড়ে যায়। এদিকে হরিণীটি প্রাণভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একটি গুহায় আশ্রয় নেয় কিন্তু অসময়ে প্রসব হওয়ায় হরিণীটি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মারা যায়

রাজর্ষি ভরত নদীর তীরে বসে মাতৃহারা সদ্যোজাত শাবকটিকে জলে ভেসে যেতে দেখলেন দেখে রাজার মনে করুণা হল। তিনি মৃগ শিশুটিকে স্রোত থেকে তুলে আনলেন সদ্যোজাত শিশুটিকে দেখার জন্য কেউ না থাকায় তিনি শিশুটিকে নিজের আশ্রমে নিয়ে গেলেন প্রকৃতপক্ষে রাজা ভরত সমস্ত প্রাণীকেই—তা সে মানুষই হোক আর পশুই হোক—সকলকেই একই দৃষ্টিতে দেখতেন তিনি জানতেন যেকোনও জীবের মধ্যেই আত্মা ও পরমাত্মা রয়েছে

হরিণ শাবকটিকে আনার পর ভরতের জীবনযাত্রাতেও কিছুটা পরিবর্তন এসে গেল। এতদিন তিনি যেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের সাধনায় কাটাতেন সেখানে তাঁর খানিকটা সময় ব্যয় হতে থাকল হরিণ শাবকটির পরিচর্যায় প্রতিদিন তিনি

শাবকটিকে টাটকা কচি ঘাস খাওয়াতেন। বিভিন্ন উপায়ে তাকে আরামে রাখার চেষ্টা করতেন এইসবের ফলে খুব তাড়াতাড়ি মহারাজ ভরত শাবকটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন তিনি শিশুটির সাথেই ঘুমোতেন, একসাথে স্নান করতেন, একসাথে ঘুরতেন এমনকি এক সাথে খুয়তেন পর্যন্ত

বনে কুশ, কুসুম, পত্র, ফল, মূল ও জল সংগ্রহ করতে যাওয়ার সময়ও ভরত হরিণ শাবকটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন কারণ তিনি শাবকটির জন্য দুঃশ্চিন্তায় থাকতেন, পাছে বাঘ, শেয়াল বা কুকুরের মতন হিংস্র জন্তু শিশুটিকে মেরে না ফেলে বনের পথে হরিণ শাবকটির শিশুসুলভ আচরণে মহারাজ ভরত মুগ্ধ হয়ে স্নেহবিহ্বল হয়ে পড়তেন তিনি শিশুটিকে কখনও কাঁধে নিয়ে ঘুরতেন আবার কখনও কোলে রাখতেন। আবার রাতে ঘুমাবার সময় শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে রাখতেন এইভাবে সারাদিন আদরের সাথে শিশুটির পরিচর্যা করতে করতে শাবকটির প্রতি তিনি আসক্ত হয়ে পড়েন

ক্রমশ হরিণ শাবকটির প্রতি এই আসক্তির জন্য ভরত ক্রমশ একাগ্র চিত্তে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা থেকে বিচ্যুত হতে থাকলেন. তিনি মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য—আত্মউপলব্ধির পথ থেকে সরে আসতে থাকলেন। বেদে বলা হয়েছে বহু লক্ষ জন্মের পর জীবাত্মা মনুষ্য দেহ লাভ করে। সেখানে এই জড় জগৎকে জন্ম ও মৃত্যুর বিশাল সমুদ্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং মনুষ্য জন্মকে একটি নৌকার সাথে তুলনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে উপরিউক্ত সমুদ্রকে অতিক্রম করা যাবে। বৈদিক শাস্ত্র, আধ্যাত্মিক গুরুদেব বা পূর্বতন আচার্যদের এখানে দক্ষ নাবিকের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং মনুষ্য জন্মের উপযোগিতাকে অনুকূল বাতাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে যা নৌকাটিকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে যদি এই সকল উপযোগিতা সত্ত্বেও কোনও ব্যক্তি তার সদ্ব্যবহার না করেন তবে

তিনি আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করবেন এবং পরবর্তী জন্মে কোনও পশুর দেহ ধারণ করার ঝুঁকি নেবেন

যদিও ভরত উপরিউক্ত সকল তথ্যই জানতেন, তবুও তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন, "এই হরিণ শাবকটি আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে, আমি কেমন করে একে অবহেলা করি? যদিও শাবকটি আমার আধ্যাত্মিক সাধনায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, তাসত্ত্বেও আমি হরিণ শাবকটিকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না যে অসহায় ব্যক্তি আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে অবহেলা করাও চরম অপরাধ "

ভরত যখন ধ্যান করতেন তখন তাঁর অবচেতন মনে চলে আসত হরিণ শাবকটির ভাবনা। এরকমই একদিন যখন ভরত ধ্যান করছিলেন, অন্যান্য সময়ের মতন তখনও তিনি ভগবানের পরিবর্তে হরিণ শাবকটির কথা ভাবতে লাগলেন ভাবতে ভাবতে তাঁর মনসংযোগ নষ্ট হল। কিন্তু চোখ মেলে তিনি শাবকটিকে কাছাকাছি কোথাও দেখতে পেলেন না চারদিকে তাকিয়ে তিনি শাবকটিকে খুঁজতে লাগলেন। যখন কোথাও শাবকটিকে দেখতে পেলেন না, তাঁর মন চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি এমনভাবে চারদিকে চোখমেলে শাবকটিকে খুঁজতে লাগলেন যে তাঁকে দেখে মনে হলো যে কোনও কৃপণ তাঁর টাকা হারিয়ে ফেলেছে তিনি ধ্যান থেকে উঠে পড়লেন এবং আশ্রমের চারপাশে শাবকটিকে খুঁজতে লাগলেন কিন্তু কোথাও তিনি মৃগশিশুটিকে খুঁজে পেলেন না

ভরত ভাবলেন, "কখন হরিণ শাবকটি ফিরে আসবে? সেকি বাঘ ও অন্য সব জন্তু থেকে সুরক্ষিত আছে? কখন আবার আমি দেখতে পাব যে শিশুটি এই আশ্রমের উপবনে চড়ে বেড়াচ্ছে, নরম কচি ঘাস খাচ্ছে?'

এইভাবে যখন সারাটা দিন কেটে গেল কিন্তু শাবকটি ফিরে এল না, তখন ভরত ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি মনে মনে

ভাবলেন, "আমার প্রিয় হরিণ শাবকটিকে কি কোনও নেকড়ে বা কুকুর খেয়ে ফেলেছে? নাকি যখন সে একা ছিল তখন একপাল বন্য শুয়োর বা বাঘ তাকে আক্রমণ করল? সূর্য এখন অস্তাচলে যাচ্ছে, কিন্তু মাতৃহারা হয়ে যে অসহায় পশুটি আমাকে বিশ্বাস করেছিল, সে এখনও ফিরে এল না।"

তাঁর মনে পড়তে লাগল হরিণ শিশুটি কিভাবে তার সঙ্গে খেলত, কিভাবে তার নরম ও ছোট ছোট শিং দিয়ে তাকে স্পর্শ করত। আবার কখনও কখনও তাঁর পুজোয় বা ধ্যানে বিঘ্ন হচ্ছে দেখে তিনি কিভাবে হরিণ শাবকটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতেন, তাঁকে তিরস্কার করতেন এবং তখন শাবকটি অত্যন্ত ভয় পেয়ে খেলা ছেড়ে তাঁর অদূরে স্থির হয়ে বসে থাকত।

তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, "আমার হরিণ শাবকটি ছোট্ট রাজপুত্রের মতন। কখন সে ফিরে আসবে? কখন সে আবার ফিরে এসে আমার হৃদয়কে শান্ত করবে?"

নিজের আবেগকে সংযত করতে না পেরে, ভরত চাঁদের আলোয় হরিণ শাবকটির পদচিহ্ন অনুসরণ করে সেদিকে ছুটতে লাগলেন। সেইসাথে উন্মাদের মতন প্রলাপ বকতে লাগলেন—"ঐ মৃগশিশু আমার এতই প্রিয় ছিল যে, আমার মনে হচ্ছে আমি নিজের পুত্রকে হারিয়েছি। বিরহ বেদনায় আমার মনে হচ্ছে আমি কোনও দাবানলের মধ্যে রয়েছি। আমার হৃদয় এখন হতাশার আগুনে জ্বলছে।"

উন্মাদের মতন হরিণ শাবককে খুঁজতে খুঁজতে ভরত বনের ভেতর একটি বিপদসঙ্কুল পথে চলে এলেন। হঠাৎই তিনি পড়ে যান এবং সাংঘাতিক আঘাত পান। এই অবস্থায় সেখানেই তিনি পড়ে থাকলেন। ধীরে ধীরে একসময় তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গেলেন। মৃত্যুর সময় তিনি পাশে হরিণ শাবকটিকে দেখতে পেলেন। তাঁর মনে হল শিশুটি তাঁর নিজের পুত্রের মতন পাশে বসে শোক প্রকাশ করছে।

এর ফলে মৃত্যুর সময়ও রাজার মন পুরোপুরি সেই হরিণ শাবকেই নিবিষ্ট ছিল। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, "জীব যে কথা চিন্তা করে দেহ ত্যাগ করে সেই অনুসারেই সে নিঃসন্দেহে পরবর্তী শরীর প্রাপ্ত হয়।"

মহারাজ ভরতের মৃগ শরীর প্রাপ্তি

পরবর্তী জন্মে মহারাজ ভরত একটি হরিণের দেহ লাভ করলেন। অধিকাংশ জীবই তাঁর পূর্ব জন্মকে স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু ভরত তাঁর পূর্বজন্মের সুদৃঢ় ভক্তির প্রভাবে তাঁর সেই হরিণ শরীর ধারণ করার কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যার জন্য তিনি তাঁর বিগত ও বর্তমান জীবনের কথা বিবেচনা করে সবসময়ই অনুতাপ করতেন—"আমি কিরকম নির্বোধ ছিলাম। আমি আত্ম-উপলব্ধির স্তর থেকে অনেক নীচে অধঃপতিত হয়েছিলাম। যেখানে আমি নিজের রাজ্য এবং পরিবারকে পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য পবিত্র বনের নির্জন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলাম যাতে একমনে ভগবানের সেবা করতে পারি, সেখানে নিজের মূর্খতার জন্য সবকিছু ছেড়ে আমার চিত্ত একটি হরিণের প্রতি আসক্ত হয়েছিল। যার ফলে এই জন্মে আমাকে হরিণ শরীর ধারণ করতে হয়েছে। এই অবস্থার জন্য আমি ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়।"

তবে হরিণ শরীর প্রাপ্ত হলেও ভরত একটি মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি নিজের আত্ম-উপলব্ধিকে উন্নত করতে পেরেছিলেন। যার ফলে তিনি হরিণ দেহের সবরকম জাগতিক চাহিদা থেকে সরে আসতে পেরেছিলেন।

হরিণ দেহে তিনি সুস্বাদু নরম কচি ঘাস খাওয়া ছাড়লেন। সে কখনও ভাবত না কখন তাঁর সুন্দর শিং দুটো বড় হবে। সে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সব হরিণের সঙ্গ ত্যাগ করেছিল, এমনকি নিজের

মাকেও ত্যাগ করে জন্মস্থান কালঞ্জর পর্বত থেকে পুনরায় শালগ্রাম ক্ষেত্রে পুলস্ত্য-পুলহ আশ্রমে ফিরে গিয়েছিলেন। এই জন্মে সে খুবই সতর্ক ছিল যাতে কোনও অবস্থাতেই পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃত না হন। এজন্য সে মুনি ঋষিদের তপোবনের কাছেই থাকত। সবরকমের জাগতিক সম্পর্ক ছেদ করে কেবল শুকনো পাতা খেয়ে জীবনধারণ করতেন। এইভাবে হরিণ দেহে জীবন ধারণ করতে করতে যখন মৃত্যুর সময় এল অর্থাৎ হরিণ দেহ পরিত্যাগের সময় এল, তখন হরিণটি জোরে জোরে বলতে লাগল, "পরমেশ্বর ভগবানই সর্বজ্ঞানের উৎস, তিনিই যাবতীয় সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ কর্তা, প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে তিনি বিরাজ করেন। তিনি সর্বসুন্দর ও আকর্ষণীয়। তাঁর চরণে আমার বিনীত প্রণাম জানিয়ে আমি এই শরীর ত্যাগ করছি যেন আমি সর্বদা তাঁর সেবায় ব্রতী থাকতে পারি।"

জড়ভরতের জীবন

পরবর্তী জন্মে ভরত এক দরিদ্র কিন্তু অতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল জড়ভরত। ভগবানের বিশেষ কৃপায় ভরত এই জন্মেও তাঁর পূর্ব জন্মগুলোর কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—স্মৃতি, বিস্মৃতি ও জ্ঞানেরও উদ্ভব হয় আমারই থেকে।

এই জন্মে ভরত যখন বড় হয়ে উঠল তখন সে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের থেকে সবসময়ই ভয়ে ভয়ে থাকত। কারণ তারা খুব বেশীমাত্রায় জড় জগতের প্রতি আসক্ত ছিল। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ব্যাপারে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তাই জড়ভরত সবসময়ই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন থাকত যে এদের সঙ্গপ্রভাবে তাঁরও না আবার অধঃপতন ঘটে এবং সে আগের মতন পশু শরীর ধারণ করে। যার জন্য তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হলেও অন্যদের কাছে

নিজেকে উন্মাদ, অন্ধ, জড় এবং বধির প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতেন। যাতে কেউ তার সাথে কথা বলার আগ্রহ বোধ না করে। কিন্তু তিনি নিজের অন্তরে সবসময় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করতেন এবং নিরন্তর তিনি ভগবানের মহিমা কীর্তন করে যেতেন যা তাকে জন্মমৃত্যুর আবর্তন চক্রের থেকে মুক্তি দিতে পারে।

এদিকে তাঁর পিতা কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি আন্তরিকভাবে চাইতেন যেন ভরত ভবিষ্যতে একজন জ্ঞানী পণ্ডিত হয়ে ওঠে। তাই তিনি জড়ভরতকে বৈদিক শাস্ত্রের জটিল দিকগুলো বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জড়ভরত উদ্দেশ্যমূলকভাবে বোকার মতন আচরণ করত। যাতে পিতা তাকে শিক্ষালাভের অযোগ্য মনে করে আর শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা না করেন। যেমন, পিতা যদি তাঁকে কোনও কাজ করতে বলতেন তবে সে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজটি করত। তাসত্ত্বেও পিতা তাঁর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত জড়ভরতকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

পিতার মৃত্যুর পর জড়ভরতের নয় জন বৈমাত্রেয় ভাই তাকে জড় ও নির্বোধ বলে প্রতিপন্ন করে, ভরতের পড়াশুনো বন্ধ করে দেয়। তাঁরা কিন্তু ভরতের অতি উন্নত স্থিতি উপলব্ধি করতে পারেনি। জড়ভরত কখনও এর কোনও প্রতিবাদ করেনি বা তাদের একবারের জন্যও বোঝাবার চেষ্টা করেনি যে সে তেমন নয়। কারণ তিনি ছিলেন জাগতিক কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে। যা কিছু খাবার তাকে দেওয়া হোত, তা সে অল্পই হোক, সুস্বাদু বা স্বাদহীন হোক—তিনি তাই-ই আহার করতেন। ভগবদ্ভক্তির দিব্য চেতনায় তিনি এতই মগ্ন থাকতেন যে শীত বা গ্রীষ্মের মতন জাগতিক কোনও বিষয়ে তার কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। শীতের তীব্র ঠাণ্ডা বা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম বা বৃষ্টিকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না। কিন্তু দৈহিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ষাঁড়ের মতন শক্তিশালী। তবে তাঁর শরীর ছিল মলিন। মূল্যবান রত্নের জ্যোতি

যেমন ধূলোর ধরো আচ্ছাদিত থাকে তেমনই তাঁর ব্রহ্মতেজ ও জ্ঞান মলিন দেহের আবরণে ঢাকা ছিল। শরীরে ধুলোবালি মাখা থাকায় সবসময়ই তাকে অন্যদের বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত সবাই ভাবত জড়ভরত একটা আস্ত বোকা ছাড়া আর কিছু নয়।

শুধুমাত্র দুটি খেতে দেওয়ার জন্য তার বৈমাত্রেয় ভাইরা তাকে দিয়ে ক্রীতদাসের মতন অমানুষিক পরিশ্রম করাত তাকে দিয়ে জমি চাষ করাত কিন্তু শস্যক্ষেত্রে যে কিভাবে কাজ করতে হয় তা জড়ভরত জানত না। কোথায় মাটি ঢালতে হবে, কোথায় জমি সমতল করতে হবে—এই বিষয়ে জড়ভরতের কোনও জ্ঞানই ছিল না। বৈমাত্রেয় ভাইরা তাকে দিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করালেও দিনের শেষে খেতে দিত খুদ, খইল, তুষ ও পোকা খাওয়া শস্য এবং পাত্রে পোড়া লাগা অন্ন। জড়ভরত কিন্তু এই বিষয়ে কারও প্রতি কোনও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করত না। যা তাকে দেওয়া হত তাই-ই সে অমৃতের মতন গ্রহণ করত এইভাবেই জড়ভরত জড়জগতে থেকেও একটি শুদ্ধ আত্মার ভূমিকা পালন করছিলেন

ইতিমধ্যে একবার এক দস্যু সর্দার ভদ্রকালীকে পুজো দেওয়ার জন্য তার মন্দিরে পশুর পরিবর্তে নরবলির আয়োজন করে এই উদ্দেশ্যে সে এক বোকা ও নির্বোধ মানুষের খোঁজ করছিল যদিও বেদে এইরকম কোনও বলির উল্লেখ নেই এই বলির পুরো পরিকল্পনাটাই ছিল ডাকাতদের মনগড়া তারা ভেবেছিল নরবলি দিতে পারলে আরও বেশী সম্পদ লুঠ করা যাবে কিন্তু বলির জন্য যাকে আনা হয়েছিল সে পালিয়ে গেল তখন দস্যুসর্দার তার অনুচরদের পাঠাল একটা বোকা লোককে ধরে আনতে। ডাকাতের লোকরা রাতের ঘন অন্ধকারে সমস্ত বনজঙ্গল ও মাঠেঘাটে ঘুরে খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে তারা হঠাৎ মাঝরাতে ঘন অন্ধকারে শস্যক্ষেত্রে জড়ভরতকে দেখতে পেল। সে তখন একটি উঁচু জায়গায় বসে বন্য

শুয়োরের হাত থেকে শস্য রক্ষা করছিল। বলি দেওয়ার জন্য ডাকাতদের জড়ভরতকে উপযুক্ত মনে হয় সর্দারের নির্দেশ মতন লোক খুঁজে পাওয়ায় তারা খুব খুশী হয়. ভরতকে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ডাকাতরা মন্দিরে নিয়ে আসে। জড়ভরতের যেহেতু ভগবানের ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল তাই সে ডাকাতদের কোন বাঁধা দেয়নি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পূর্বতন এক বিখ্যাত আচার্যের রচিত একটি গান আছে—'হে প্রভু, আমি এখন আপনার শরণাগত আমি আপনার নিত্যদাস এবং আপনি যদি চান তাহলে আপনি আমাকে সংহার করতে পারেন অথবা রক্ষা করতে পারেন আমি আপনার সম্পূর্ণ শরণাগত সেবক।'

মন্দিরে এনে দস্যুরা জড়ভরতকে বলি দেওয়ার জন্য স্নান করায় নতুন সিল্কের বস্ত্র, অলঙ্কার এবং মালা পড়ায় তারপর তাকে ভোজন করিয়ে কালীর সামনে নিয়ে আসে. সেখানে স্তুতি ও উচ্চগীত সহকারে তারা জড়ভরতকে বলি দেবার ব্যবস্থা করে বলির সময় হলে তারা জড়ভরতকে হাঁড়িকাঠের সামনে বসতে বাধ্য করে। দস্যুর মধ্যে যে প্রধান পুরোহিত, সে একটি তীক্ষ্ণ খড়্গ নিয়ে ভরতকে বলি দিতে উদ্যত হল।

কিন্তু স্বয়ং ভদ্রকালী এটি সহ্য করতে পারলেন না তিনি বুঝেছিলেন যে এইসব পাপিষ্ঠরা ভগবানের পরম ভক্তকে হত্যা করতে চাইছে। হঠাৎই বিগ্রহ বিদীর্ণ করে দেবী স্বয়ং প্রকাশিত হলেন তাঁর শরীর অসহ্য তেজে জ্বলছিল প্রচণ্ড ক্রোধে দেবীর চোখ দুটি আরক্ত হয়ে উঠেছিল. ক্রমে তাঁর ভয়ঙ্কর দাঁতগুলি বেরিয়ে এল। তার লাল চোখ দুটি দেখে মনে হল যে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করতে এসেছেন এইভাবে দেবী ভয়ংকর রূপ ধারণ করে বেদী থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে এসে যে খড়্গ দিয়ে দস্যুরা ভরতকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল সেই খড়্গ দিয়েই দস্যুদের মস্তক ছেদন করতে লাগল

রাজার তিরস্কার শুনে শিবিকা বাহকেরা ভয় পেয়ে জানালো যে জড়ভরতের জন্যই শিবিকা দুলছে। এই কথা শুনে রাজা রহূগণ খুব রেগে গেলেন। তিনি জড়ভরতকে তিরস্কার করলেন। সেইসাথে বিদ্রূপ করে বললেন যে জড়ভরতের শিবিকা বহন দেখে মনে হচ্ছে যেন এক দুর্বল, শীর্ণ, বৃদ্ধ শিবিকা বহন করছে। কিন্তু জড়ভরত তাঁর প্রকৃত চিন্ময় স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি তাঁর দেহ নন। তিনি স্থূল বা কৃশ নন, পঞ্চমহাভূত এবং তিনটি সূক্ষ্ম উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত এই জড় পিণ্ডটির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি জানতেন যে তিনি হলেন জীবাত্মা, যা ড্রাইভারের মতন এই দেহে অবস্থান করছে। দেহটি হল মেশিন স্বরূপ। তাই জড়ভরত রাজার তিরস্কারে বিচলিত হলেন না। এমনকি রাজা যদি তাকে মেরে ফেলার আদেশও দিতেন তাতেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। কারণ তিনি জানতেন আত্মা শাশ্বত, তাকে কোনওভাবেই হত্যা করা যায় না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎ-গীতায় বলেছেন, দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না।

জড়ভরত তাই চুপ করে রইলেন। তিনি আগের মতন করেই শিবিকা বহন করতে লাগলেন। কিন্তু রাজা তার ক্রোধ দমন করতে পারলেন না। তাই চিৎকার করে বললেন, 'ওরে বদমাস, তুই কি করছিস? তুই জানিস না যে আমি তোর প্রভু? তোর এই অবজ্ঞার জন্য আমি তোকে শাস্তি দেব।'

জড়ভরত বললেন, 'হে বীর রাজা, আপনি আমার সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য। আপনি মনে করছেন যে আমি শিবিকা বহনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিনি। এটা ঠিক, কারণ আমি আপনার শিবিকা বাহক নয়। আমার শরীর এটিকে বহন করছে, কিন্তু আমি আমার এই দেহ নই। আপনি বলছেন যে, আমি হৃষ্টপুষ্ট নই, এর থেকেই বোঝা যায় আপনি আত্মা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দেহ স্থূল বা কৃশ হতে পারে, দুর্বল বা শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি আত্মা সম্বন্ধে এই কথা বলবে না। আমার আত্মা স্থূল বা কৃশ নয়; তাই আপনি যে বললেন আমি যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট নই সেটা অবশ্যই ঠিক।'

জড়ভরত তখন রাজাকে নির্দেশ দিয়ে বলতে লাগলেন, 'হে রাজা, আপনি মনে করেছেন আপনি হচ্ছেন রাজা এবং আমি হচ্ছি আপনার ভৃত্য, আর তার জন্যই আপনি আমাকে আদেশ করছেন। কিন্তু আপনি রাজা আর আমি ভৃত্য—এই সম্পর্ক সবসময় ঠিক নয়। কারণ এটি ক্ষণস্থায়ী। আজকে আপনি রাজা আর আমি ভৃত্য। পরজন্মে আমাদের এই সম্পর্ক উল্টোও হতে পারে। আপনি ভৃত্য আর আমি প্রভু হয়ে জন্মাতে পারি।

ঠিক যেমন সমুদ্রে ভাসমান ঢেউ তৃণগুলোকে একত্রিত করে আবার পরমুহূর্তেই তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তেমনি নিত্য সময়-এর ফলে সাময়িকভাবে বিভিন্ন জীবের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। নিত্য সময় তাদের পৃথক করে ফেলে আবার নতুন করে সাজায়।

জড়ভরত আরও বলল, 'সেইজন্য যেকোনও ক্ষেত্রে কে প্রভু? আর ভৃত্যই বা কে? সকলেই জড়া প্রকৃতির নিয়মে বাধা। এজন্য কেউ প্রভু নয় আর কেউ কারও ভৃত্য নয়।

বেদে বলা হয়েছে যে এই জড় জগতে প্রত্যেক মানুষই মঞ্চে অভিনয় করছে, কোনও এক ঊর্ধ্বতনের নির্দেশে। মঞ্চে একজন অভিনেতা প্রধান ভূমিকা নেয়, বাকিরা তার ভৃত্যের ভূমিকায় অভিনয় করে। কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে একজন নির্দেশকের নির্দেশে অভিনয় করে চলেছে। একইভাবে সমস্ত জীবই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য। এইজন্য এই জড় জগতে যেকোনও দুটি জীবের প্রভু-ভৃত্যের ভূমিকা সাময়িক ও কাল্পনিক।'

রাজা রহূগণের কাছে এসব কিছু ব্যাখ্যা করে জড়ভরত বললেন যে, "যদি আপনি এখনও মনে করেন আপনি প্রভু এবং আমি আপনার

ভৃত্য, তাহলে আমি তা মেনে নেব। আপনি আমাকে নির্দেশ দিন। আমি এখন আপনার জন্য কি করতে পারি?"

রাজা রহূগণেরও পরম তত্ত্ব বিষয়ে গভীর শ্রদ্ধা ছিল জড়ভরতের শিক্ষা শুনে তিনি আশ্চর্য বোধ করলেন বুঝতে পারলেন, ইনি এক মহান ব্যক্তি। রাজা তৎক্ষণাৎ শিবিকা থেকে নেমে এলেন, তার জড় জাগতিক ধারণা দূর হল তিনি ভূমিতে পড়ে জড়ভরতের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর মস্তক স্থাপন করে প্রণাম নিবেদন করলেন।

তিনি বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, আপনি সকলের অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্নভাবে এই জগতে কেন বিচরণ করছেন। আপনি কে? আপনি কোথায় থাকেন? আপনি এই স্থানে কেন এসেছেন? হে পরম গুরু আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দয়া করে বলুন, আমি কিভাবে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করতে পারব?"

রাজা রহূগণের এই ব্যবহার একটি আদর্শ উদাহরণ। বেদে বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই এমনকি রাজাদেরও একজন আধ্যাত্মিক গুরু থাকা আবশ্যক এর ফলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয়। উপলব্ধি করা যায়, আত্মা কি, পরজন্ম কি?

জড় ভরত উত্তরে বললেন, "এই জগতে জীব তার জাগতিক চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন দেহ ধারণ করে এবং জাগতিক কর্মের আনন্দ ও বেদনা বোধ করে।"

রাত্রে ঘুমিয়ে সুখ বা দুঃখের অনেক স্বপ্ন দেখা যায় কেউ স্বপ্নে দেখতে পারে যে সে কোনও সুন্দরী মহিলার সঙ্গে রাত্রিযাপন করছে, কিন্তু এটা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয় আবার কেউ স্বপ্নে দেখতে পারে যে তাকে বাঘ আক্রমণ করেছে। কিন্তু এই ভয়ার্ত পরিস্থিতিও অবাস্তব একইভাবে জাগতিক আনন্দ, হতাশা, কেবলমাত্র মানসিক ব্যাপার। দেহ ও জাগতিক সম্পত্তির ওপর ভিত্তি করেই এটি সৃষ্টি হয়। যখন কারও আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয়, তখন সে বুঝতে

পারে যে এতদিন সে কিছুই করেনি। আর এই আধ্যাত্মিক চেতনা তখনই জাগ্রত হয় যখন সে একান্তভাবে ভগবানের সাধনায় ব্রতী হয়

কেউ যদি তার মনকে একান্তভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে না পারেন, তাহলে তাকে অবশ্যই জড়ভরত যেমন বর্ণনা করেছে সেইরকম জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তনচক্রে প্রবেশ করতে হবে
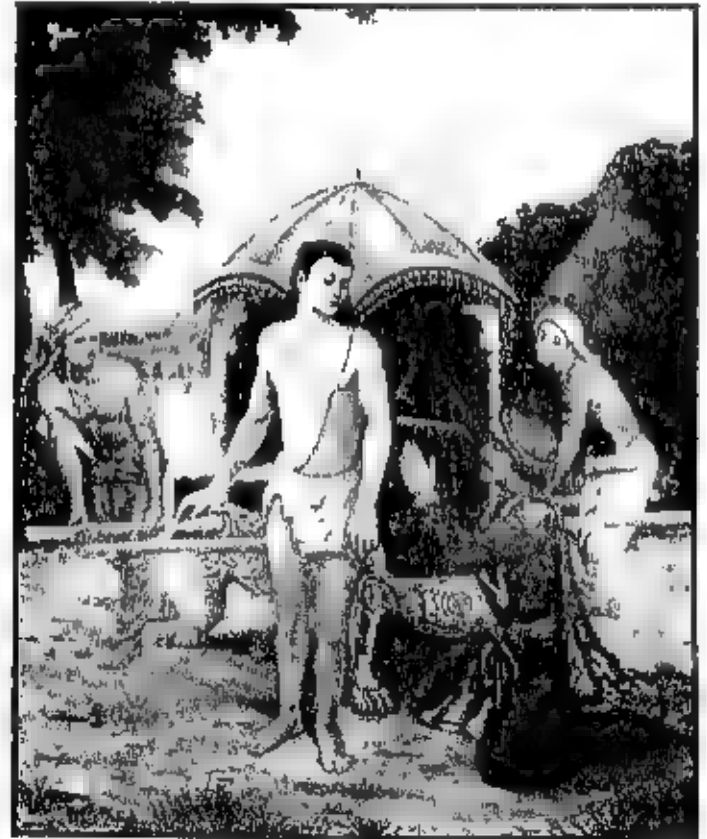
জড় ভরত বললেন, 'বিভিন্ন মানসিক অবস্থাই বিভিন্ন শরীর প্রাপ্তির কারণ। যখন কারও মন আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিয়োজিত থাকে তখন সে পরবর্তী জন্মে উন্নত শরীর লাভ করে। কিন্তু কেউ জাগতিক আনন্দে মনকে নিয়োজিত রাখে পরবর্তী জন্মে সে নিচু শ্রেণীর কোনও প্রজাতির শরীর লাভ করে।

জড় ভরত মনকে একটি দীপের শিখার সাথে তুলনা করেছিলেন। "দীপের পলতে যখন ঠিকমতন জ্বলে না তখন তা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোয়। কিন্তু দীপ যখন ঘৃতপূর্ণ হয়ে যথাযথভাবে জ্বলতে থাকে তখন তা থেকে উজ্জ্বল শুভ্র দীপ্তি প্রকাশিত হয়।" তেমনই মন যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগে আসক্ত থাকে, তখন তা দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়। কিন্তু মন যখন বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত হয়, তখন কৃষ্ণভাবনার দীপ্তি প্রকাশ পায়।

জড়ভরত এই কথা বলে রাজাকে সতর্ক করে বললেন যে, যতক্ষণ কেউ তার দেহটিকেই তার স্বরূপ বলে মনে করে ততক্ষণ সে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করবে বিভিন্ন প্রজাতির মাধ্যমে। তাই অসংযত মন হল যেকোনও জীবের সবচেয়ে বড় শত্রু।

"হে রাজা রহূগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত বদ্ধ আত্মা জাগতিক শরীর লাভ করছে এবং জাগতিক বিষয় উপভোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নিজের চেতনাকে জয় করতে পারছে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আত্ম উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জড় জগতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শরীরে তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে।

জড়ভরত তখন নিজের পূর্ব জন্মের কথা বললেন। "পূর্বজন্মে আমি ছিলাম মহারাজ ভরত। কিন্তু জাগতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে আমি সিদ্ধিলাভ করেছিলাম। তখন আমি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একটি

হরিণ শাবকের প্রতি আমি এতই আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম যে আমি আমার পারমার্থিক কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করতে থাকি। মৃত্যুর সময়ও আমি কেবল হরিণটির কথাই স্মরণ করেছিলাম। তাই পরবর্তী জন্মে আমাকে হরিণ শরীর ধারণ করতে হয়।"

জড়ভরত তার শিক্ষা সমাপ্তে সিদ্ধান্ত স্বরূপ রাজাকে বললেন যে, যিনি জন্মান্তরের চক্র থেকে মুক্তি পেতে চান তাকে সবসময়ই ভগবানের পরমভক্তের সঙ্গ করতে হবে। এই সঙ্গ প্রভাবেই যেকোনও ব্যক্তি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং জ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা জড় জগতের মোহের বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন।

তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করতে না পারছে ততক্ষণ তার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাথমিক জ্ঞানই লাভ হয় না। প্রকৃত তথ্য একজন তখনই লাভ করতে পারে যখন সে কোনও শুদ্ধ ভক্তের কৃপা লাভ করে। কারণ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করলে রাজনীতি, সমাজনীতির মতন কোনও জাগতিক বিষয়ের আলোচনা করা হয় না। শুদ্ধ ভক্ত শুধুই শ্রীভগবানের বিষয়ে আলোচনা করেন। এর মাধ্যমেই কেউ তার সুপ্ত আধ্যাত্মিক চেতনাকে বিকশিত করতে পারে। সেইসাথে এর মাধ্যমেই সে পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দময় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারে।

মহাভাগবত জড় ভরতের কাছ থেকে উপদেশ পাওয়ার পর মহারাজ রহূগণ সর্বতোভাবে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। যার ফলে তিনি সম্পূর্ণভাবে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। যার ফলে শুদ্ধ আত্মা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনচক্র থেকে মুক্তি পায়।

বিষ্ণু-দূতেরা যখন দেখলেন, যম দূতেরা অজামিলের হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে আত্মাকে ছিনিয়ে নিচ্ছে, তখন তাঁরা চিৎকার করে উঠলেন— "থামো"

৩

কালের পর্যটক

অন্তিমকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন,

—ভগবদ্গীতা ৮/৬

পৃথিবীর মহান ধর্মসমূহের ঐতিহ্য অনুসারে মৃত্যুর পরে আত্মা যখন রহস্যময় পথে যাত্রা করে তখন তার অন্য স্তরের বাস্তবতার জীবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়; তারা দেবদূত, তারা তাকে সাহায্য করে অথবা মহাজাগতিক বিচারের পরিমাপে তার শুভ ও অশুভ কর্মের বিচার করে। মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সামগ্রিক সীমাজুড়ে বিভিন্ন ধর্মীয় শিল্প-বস্তুর মাঝে এই ধরনের দৃশ্যাবলী খোদিত রয়েছে। ইট্রুরিয়ার অধিবাসীদের মৃৎশিল্পের অসম্পূর্ণ অংশের মাঝে এক পতিত যোদ্ধার পাশে উপস্থিত এক দেবদূতসম মূর্তির অঙ্কিত চিত্র লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টিয়ান মার্বেল পাথরেও বিচারের তুলাদণ্ড হাতে এক ভীষণদর্শন সেন্ট মাইকেল প্রদর্শিত হয়। অনেক মানুষ আছেন যাদের প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের কাছেও কখনও কখনও এই ধরনের ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হবার খবর পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের বৈদিক শাস্ত্রগুলি থেকে আমরা বিষ্ণুদূতেদের কথা জানতে পারি। যারা মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়ে পবিত্র আত্মাকে বৈকুণ্ঠ ধামে যাবার পথে সঙ্গ দেয়। বেদে মৃত্যুর দেবতা যমরাজের ভয়ঙ্কর দূতদের কথা বলা আছে। এরা যেসব মানুষ পাপ কাজ করেছে তাদের আত্মাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় এবং জড় দেহে

পরবর্তী জন্ম নেওয়ার জন্য সেই আত্মাকে কারাগারে রেখে প্রস্তুত করে। এখানে বর্ণিত ঐতিহাসিক কাহিনীটিতে বিষ্ণুদূত এবং যমদূতেরা অজামিলের ভাগ্য নির্ণয় করেছেন যে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে নাকি তাঁর পুনর্জন্ম হবে।

কান্যকুব্জ নগরে অজামিল নামে এক তরুণ ব্রাহ্মণ বাস করতেন ব্রাহ্মণ হলেও এক বেশ্যা রমণীকে বিবাহ করে তিনি তাঁর সকল ব্রাহ্মণোচিত সদ্‌গুণ হারিয়েছিলেন। চুরি, ডাকাতি, জুয়াখেলার মতন বিভিন্ন দুষ্কর্মের মাধ্যমে অজামিল তাঁর দিন যাপন করতেন

ইতিমধ্যে অজামিলের অনেকগুলো পুত্র হয়। স্ত্রী ও পুত্রদের লালন-পালন করার জন্য সে বিভিন্ন পাপকাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, এইভাবেই অজামিল তাঁর জীবনের ৮৮টি বছর অতিক্রান্ত করে ফেলে, এই ৮৮ বছর বয়সেও তাঁর একটি পুত্র হয়। সর্বকনিষ্ঠ এই পুত্রটির নাম ছিল নারায়ণ। অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুর নামেই শিশুটির নামকরণ করা হয়েছিল সবচেয়ে ছোট হওয়ায় এই শিশুটি অজামিলের খুবই প্রিয় ছিল। সবসময়ই সে শিশুটির সঙ্গে সঙ্গে থাকত এবং শিশুসুলভ কার্যকলাপ দেখে আনন্দিত হত।

একদিন হঠাৎই নির্বোধ অজামিলের আয়ু শেষ হয়ে এল অজামিল দেখতে পেল যে কয়েকজন বিকৃত মুখের ভয়ঙ্কর দর্শন পুরুষ তাঁকে যমালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে তাদের হাতে ছিল শক্ত দড়ি, যা দিয়ে অজামিলকে মৃত্যুর দেবতা যমরাজের সভায় শক্ত করে বেঁধে নেওয়া যায় এইরকম ভৌতিক অবস্থা দেখে অজামিল হতবুদ্ধি হয়ে গেল। স্নেহ বশীভূত হয়ে সে তাঁর শিশুপুত্রটিকে ডাকতে লাগল

শিশুটি তখন কাছেই খেলা করছিল। অজামিল জোরে জোরে শিশুটির নাম ধরে ডাকতে লাগল, "নারায়ণ। নারায়ণ " এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে নিজের অজান্তেই শিশুপুত্রকে ডাকতে গিয়ে অজামিল স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের নাম করতে লাগল।

বিষ্ণুদূতেরা মরণোন্মুখ অজামিলের মুখে তাদের প্রভুর দিব্য নাম শুনে তক্ষুণি সেখানে উপস্থিত হলেন। তাদের দেখে মনে হল যে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু এসে উপস্থিত হয়েছেন তাদের চোখগুলো ছিল পদ্মফুলের পাপড়ির মতন, মাথায় ছিল স্বর্ণমুকুট, তাদের বস্ত্রগুলি ছিল পীতবর্ণের, গলায় পদ্মফুলের মালা তারা ছিল নবযৌবন সম্পন্ন তাদের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা এক অপূর্ব জ্যোতির দ্বারা ঐ মৃত্যুময় স্থানটির অন্ধকার দূর করছিল। তাদের হাতে ছিল ধনুক, তূণ, অসি, গদা, শঙ্খ, চক্র গদা, পদ্ম

বিষ্ণুদূতেরা অজামিলের কাছে এসে যমরাজের দূতেদের দেখতে পেলেন। যমদূতেরা তখন অজামিলের আত্মাকে তার হৃদয়ের ভেতর থেকে টেনে বার করছিল এই দেখে বিষ্ণুদূতেরা বজ্রনির্ঘোষ স্বরে তাদেরকে নিবৃত্ত হতে বললেন

এর আগে যমদূতদের এইভাবে কেউ কোনও দিন বাধা দেয়নি বিষ্ণুদূতেদের বজ্রকঠিন প্রতিরোধে তারা চমকে উঠল তারা প্রশ্ন করল, "আপনারা কে?" "কেন আপনারা আমাদের বাধা দিতে চেষ্টা করছেন? আমরা মৃত্যুর দেবতা যমরাজের দূত "

বিষ্ণুদেবের সেবকরা হেসে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, "তোমরা যদি সত্যিই যমরাজের সেবক হও, তাহলে আমাদের কাছে ধর্মের স্বরূপ এবং অধর্মের লক্ষণ বল আমাদের কাছে বল জন্ম ও মৃত্যু চক্রের অর্থ কি? কারা এই চক্রে প্রবেশ করবে, আর কারা করবে না?"

যমদূতেরা উত্তরে বলল, "সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, চন্দ্র, দেবতা, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, দিক, জল, পৃথিবী এবং পরমাত্মা স্বয়ং জীবের সমস্ত কাজের সাক্ষী। এইসব সাক্ষীদের দ্বারা বিজ্ঞাত অধর্ম আচরণকারীরাই দণ্ড পাবে সকাম কর্মে লিপ্ত প্রতিটি ব্যক্তিই তাদের পাপকর্ম অনুসারে দণ্ড পাবে।

বাস্তবিক পক্ষে জীবাত্মা আধ্যাত্মিক জগতে ভগবানের নিত্য দাস হিসেবে থাকে। যখনই ভগবৎ-সেবা থেকে সরে যায় তখনই তাঁরা জড় জগতে প্রবেশ করে। জড়া প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের দ্বারা গঠিত। যমদূতেরা বলল, এই জড়া প্রকৃতিকে উপভোগ করার ইচ্ছার জন্য জীবাত্মা এই তিনটি গুণে আবদ্ধ হয়। এই তিনটি গুণে আবদ্ধ হওয়ায় প্রকৃতি অনুযায়ী জীবাত্মা উপযুক্ত দেহ ধারণ করে। সত্ত্বগুণে আবদ্ধ হলে দেবতার দেহ লাভ করে, রজোগুণে আবদ্ধ হলে মনুষ্য দেহ লাভ করে এবং তমোগুণে আবদ্ধ হলে নিম্নতর পশুদেহ লাভ করে।

এইসব শরীর সেই শরীরের মতন যা আমরা স্বপ্নে অনুভব করে থাকি। একজন মানুষ যখন ঘুমায় তখন সে তাঁর প্রকৃত পরিচিতি ভুলে যায়। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে হয়ত দেখে যে সে রাজা হয়ে গেছে। শোবার আগে সে কি করেছিল, তা সে মনে করতে পারে না, এমনকি ঘুম থেকে উঠে সে কি করবে তাও সে ভাবতে পারে না। সেইরকমই, যখন আত্মা কোন অস্থায়ী, জড় দেহে প্রবেশ করে তখন সে তাঁর আসল আধ্যাত্মিক পরিচয় ভুলে যায়। এমনকি জড় জগতে তাঁর আগের জন্মের কথাও সে স্মরণ করতে পারে না। যদিও অধিকাংশ মানব আত্মাই ৮,৪০০,০০০ যোনীতে দেহান্তরিত হয়েছে।

যমদূতেরা বলল, আত্মা এইভাবে এক জড় শরীর থেকে অন্য শরীরে দেহান্তরিত হয়ে মানব জন্ম, পশুজন্ম এবং দেবতার জন্ম লাভ করে। আত্মা দেব শরীরে প্রবেশ করলে খুব খুশী হয়। মানব শরীর লাভ করলে সে কখনও সুখী হয়, কখনও দুঃখী হয়। আবার পশু শরীর লাভ করলে সে সবসময় ভয়ে ভীত থাকে। এইসব অবস্থাতেই আত্মাকে জন্ম, মৃত্যু, জড়া, ব্যাধি ভোগ করে ভয়ঙ্কর কষ্ট পেতে হয়। এই দুঃখজনক অবস্থাকেই সংসার বলে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রজাতির জীবনের মাধ্যমে আত্মার দেহান্তরণ।

যমদূতেরা বলল, "মূর্খ দেহস্থ আত্মা তাঁর নিজের চেতনা বা মনকে বশে রাখতে পারে না। তাই না চাইলেও তাঁরা জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য হয়। তাঁরা রেশম পোকার মতন। রেশম পোকারা নিজেদের লালা দিয়ে কোকুন তৈরী করে সেই কোকুনেই আটকে যায়। জীবাত্মাও নিজের সকাম কর্মের জালে নিজেই আটকে যায়। তারপর আর নিজেকে মুক্ত করার জন্য কোনও পথ খুঁজে পায় না। এই ভুল সে প্রতিনিয়ত করে থাকে। ফলে ক্রমাগত জন্ম নিতে থাকে।

যমদূতেরা আরও বলল, "নিজের তীব্র জড় আসক্তিক বাসনার জন্য জীবাত্মা কোন বিশেষ পরিবারে জন্ম নেয়। জন্ম নিয়ে মা অথবা বাবার মতন শরীর লাভ করে। সেই শরীর তাঁর অতীত ও ভবিষ্যত জীবনকে চিহ্নিত করে। যেরকম একটি বসন্ত তার অতীত ও ভবিষ্যত বসন্তকে নির্দেশ করে।"

জীবের মানব-জন্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষই শুধুমাত্র দিব্যজ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারে। যে জ্ঞান তাকে জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তন চক্র থেকে মুক্ত করতে পারে। কিন্তু অজামিল তাঁর মানবজন্মকে নষ্ট করেছে।

যমদূতেরা বলল, "অথচ প্রথমে অজামিল সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিল। সে ছিল সদ্‌ চরিত্রের অধিকারী, সত্যবাদী এবং সদাচারী। সে খুব নম্র ও ভদ্র ছিল এবং নিজের বুদ্ধি ও চেতনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখত। অধিকন্তু সে জানত কিভাবে বৈদিক মন্ত্র জপ করতে হয়। মোটের ওপর অজামিল অত্যন্ত পবিত্র ছিল। সে সবসময় তাঁর গুরুদেব, অতিথি ও গুরুজনদের সম্মান করত। তাঁর কোন অহংকার ছিল না। সকল প্রকার জীবের প্রতিই সে সদয় ছিল এবং কখনও কাউকে হিংসা করত না।

কিন্তু একবার অজামিল তাঁর পিতার আদেশে ফল ও ফুল সংগ্রহ করার জন্য বনে গিয়েছিল। ঘরে ফেরার সময় সে এক অত্যন্ত কামার্ত শূদ্রকে লজ্জা পরিত্যাগ করে একটি বেশ্যার সাথে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে. শূদ্রটি আনন্দ প্রকাশ করতে হেসে হেসে গান গাইছিল। সেই শূদ্র ও বেশ্যা—দুজনেই সুরা পানে উন্মত্ত ছিল। সুরাপানের জন্য সেই বেশ্যার চোখ দুটো ঘুরছিল এবং তার পরনের কাপড় শিথিল হয়ে পড়েছিল।

এইরকম অবস্থায় শূদ্র ও বেশ্যাকে দেখে অজামিলের সুপ্ত কামনা বাসনাও উদ্দীপ্ত হয়েছিল বিমোহিত হয়ে সে তখন কামের বশীভূত হয়ে পড়ে।

যদিও অজামিল শাস্ত্রনির্দেশ যথাসাধ্য স্মরণ করে এবং জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু হৃদয়ে মদন বেগের প্রভাবে সে তাঁর মনকে সংযত করতে পারল না এরপর থেকে সে সবসময়ই বেশ্যার চিন্তায় মগ্ন থাকত কিছুদিনের মধ্যেই সেই বেশ্যাকে অজামিল তাঁর গৃহে দাসীরূপে নিয়ে আসে

এরপর থেকে অজামিল যাবতীয় ব্রাহ্মণোচিত আচার-আচরণ পরিত্যাগ করেছিল। সেই বেশ্যাকে নানা উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করার জন্য অজামিল তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ ব্যয় করতে থাকে। এমনকি সেই বেশ্যার জন্য সে তার অতি সুন্দরী, নবযৌবনা, সৎ ব্রাহ্মণ বংশের পত্নীকেও পরিত্যাগ করে।

"অজামিল ধীরে ধীরে একটি দুর্বৃত্তে পরিণত হয় সেই বেশ্যার পুত্র কন্যা সমন্বিত পরিবার প্রতিপালন করার জন্য অর্থ উপার্জন করতে সে নানা ন্যায্য ও অন্যায্য উপায় অবলম্বন করতে থাকে তাঁর এই সব পাপকর্মের জন্য আমরা তাকে যমরাজের সভায় নিয়ে যাব সেখানে সে তাঁর পাপকর্ম অনুযায়ী দণ্ডভোগ করবে এবং উপযুক্ত শরীরে এই জড় জগতে আবার ফিরে আসবে "

যুক্তি ও তর্কে সবসময় পারদর্শী বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের বক্তব্য শুনে বললেন, "এটা কতখানি বেদনাদায়ক, যাঁরা ধর্মের পালক, তাঁরা অনর্থক একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে দণ্ড দিচ্ছেন। অজামিল ইতিমধ্যেই তাঁর সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি কেবলমাত্র এই জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্তই করেননি, মৃত্যুর সময় বিবশ হয়ে নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে তাঁর কোটি কোটি জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে যার ফলে তিনি এখন শুদ্ধ হয়ে মুক্তিলাভের যোগ্য হয়েছেন

বিষ্ণুদূতেরা বললেন, "চোর, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গো-হত্যাকারী, রাজহত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী সহ অন্য যে সমস্ত মহাপাতকী রয়েছে, শ্রীবিষ্ণুর নাম জপই তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত কেবল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্যনাম উচ্চারণের ফলেই এই সব পাপীরা ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভগবান তখন মনে করেন, "যেহেতু এই ব্যক্তি আমার নাম স্মরণ করেছে তাই আমার কর্তব্য হল তাঁকে রক্ষা করা "

বর্তমানের কলহ ও কপটতার যুগে যদি কেউ পুনরাবর্তনের চক্র থেকে মুক্তি পেতে চায় তবে তাঁকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে যেতে হবে। কারণ মুক্তির একমাত্র অবলম্বন এই মন্ত্রের কীর্তন হৃদয়ের সমস্ত কলুষতাকে সর্বোতভাবে বিধৌত করে। যার ফলে জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তন চক্রের ফাঁদস্বরূপ জড় জাগতিক কামনা বাসনা থেকে মানুষ মুক্ত হয়।

"সঙ্গীত বিনোদনের জন্য হোক বা অশ্রদ্ধার সঙ্গেই হোক ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে তৎক্ষণাৎ যে কেউ অশেষ পাপ থেকে মুক্ত হয়। শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ মহাজনেরা সেই কথা স্বীকার করেছেন।"

"ভগবানের দিব্য নাম জপ করে যদি কেউ দুর্ঘটনায় বা হিংস্র পশুর আক্রমণে বা কোন অসুখে মারা যায়, অথবা কোন অস্ত্রের আঘাতে

মারা যায় তবে সে তৎক্ষণাৎ পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যায় অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করে, তেমনই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভগবানের নামকীর্তন করলে, সকল পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

"কেউ যদি কোন ওষুধের শক্তি সম্বন্ধে অবগত না হয়ে সেই ওষুধ সেবন করে অথবা তাকে জোর করে সেবন করানো হয়, তাহলে সে ওষুধের প্রভাব না জানলেও তা ক্রিয়া করবে। তেমনই ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের প্রভাব না জানলেও কেউ যদি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তা উচ্চারণ করে, তার ফলে সে মুক্তি লাভ করবেই।"

বিষ্ণুদূতেরা বললেন, "মৃত্যুর সময় অজামিল অসহায় হয়ে অতি উচ্চস্বরে ভগবানের নাম উচ্চারণ করেছেন কেবল সেই নামোচ্চারণই সমস্ত পাপময় জীবনের কর্মফল থেকে ইতিমধ্যেই তাঁকে মুক্ত করেছে। অতএব, তাঁকে নরকে দণ্ডভোগ করার জন্য তোমাদের প্রভুর কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না

বিষ্ণুদূতেরা এইভাবে ব্রাহ্মণ অজামিলকে যমদূতদের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন অজামিল ভয়মুক্ত হয়ে প্রকৃতস্থ হয়েছিল। সে নতমস্তকে বিষ্ণুদূতদের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছিল কিন্তু যখন বিষ্ণুদূতেরা দেখলেন অজামিল কিছু বলতে চাইছে তারা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অজামিল বিস্মিত হয়ে ভাবল 'আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম? নাকি এটাই বাস্তব? আমি দেখছিলাম ভয়ঙ্কর দেখতে কিছু পুরুষলোক দড়ি নিয়ে আমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছিল তাঁরা কোথায় গেল? আর সেই সুদর্শন চার সিদ্ধপুরুষ, যারা আমায় বাঁচাল তারাই বা কোথায় গেল?"

অজামিল তখন তার পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ করল। "ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে আমার কতই না অধঃপতন হয়েছিল আমি আমার ব্রাহ্মণোচিত গুণ হারিয়ে একটি বেশ্যার গর্ভে সন্তানের জন্ম দিয়েছি আমি আমার তরুণী সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছি আমার পিতা মাতা বৃদ্ধ ছিলেন তাদের দেখাশুনো করার জন্য অন্য কোন পুত্র বা বন্ধু ছিল না যেহেতু আমি তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করিনি, তাই তাদের নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। এই সব পাপ কাজের পরিণতি আমার কাছে এখন স্পষ্ট। আমার মতন পাপীকে পরবর্তী জন্মে দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করানো উচিত

অজামিল ভাবল "আমি দুর্ভাগা। কিন্তু আমার কাছে আরেকবার সুযোগ এসেছে। আমি একান্তভাবে চেষ্টা করব যাতে আমাকে এই জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন চক্রে পুনরায় ফিরে আসতে না হয়।

অজামিল তাঁর বেশ্যা পত্নীকে পরিত্যাগ করে হিমালয় পর্বতের কোলে পবিত্র স্থান হরিদ্বারে চলে গেল। সেখানে সে একটি বিষ্ণু মন্দিরে আশ্রয় নিল

এই মন্দিরে সে পরমেশ্বর ভগবানের আধ্যাত্মিক সেবা ভক্তিযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হল। এইভাবে যখন তার মন এবং বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শ্রীরূপে নিবদ্ধ হল, তখন ব্রাহ্মণ অজামিল আবার তাঁর সম্মুখে চারজন দিব্য পুরুষকে দেখতে পেল তাদের সে পূর্বদৃষ্ট চারজন পুরুষ বলে চিনতে পারল যারা তাঁকে মৃত্যু দূতদের থেকে বাঁচিয়েছিল। মস্তক অবনত করে সে তাঁদের প্রণাম করল

হরিদ্বারে গঙ্গার তীরে অজামিল তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করল সে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ পুনরায় প্রাপ্ত হল। বিষ্ণুদূতদের সঙ্গে স্বর্ণনির্মিত বিমানে আরোহন করে অজামিল আকাশ-মার্গে লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধামে গমন করেছিল যেখান থেকে পুনর্জন্মের মাধ্যমে পুনরায় জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।
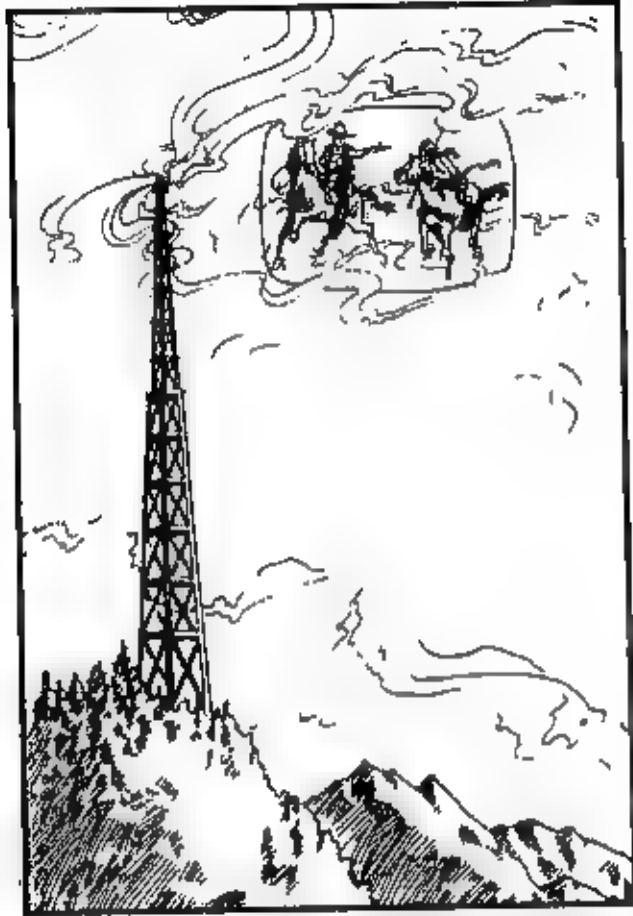
সূক্ষ্ম-রূপের যে আকাশে অস্তিত্ব আছে সেটি আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা টেলিভিশনের রূপতরঙ্গ প্রেরণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন. বায়বীয় বা গাগনিক উপাদান সমূহের কার্যের মাধ্যমে এই রূপ-তরঙ্গকে এক স্থান হতে আরেকস্থানে প্রেরণ করা হচ্ছে।

৫

আত্মার গোপন যাত্রা

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকৃত
রচনার বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতি

একটি জীবন সময়ের এক পলকের মতো

অনাদি কাল ধরে জীব প্রায় নিরন্তর বিভিন্ন যোনিতে এবং বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করছে এই প্রক্রিয়া ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হয়েছে *ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া*—মায়ার প্রভাবে, সকলেই বহিরঙ্গ শক্তি প্রদত্ত দেহে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করছে জড়-জাগতিক জীবন হচ্ছে কর্ম এবং তার ফলের একটি ক্রম এটি যেন কর্ম এবং কর্মফল সংক্রান্ত চলচ্চিত্রের একটি দীর্ঘ ফিল্মের রীল এবং প্রতিক্রিয়ার এই প্রদর্শনীতে একটি জীবন একটি পলকের মতো শিশুর যখন জন্ম হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তার বিশেষ শরীরটি হচ্ছে আর এক প্রকার কার্যকলাপের শুরু এবং বৃদ্ধাবস্থায় যখন কারও মৃত্যু হয়, তখন বুঝতে হবে যে, এক প্রকার কর্মফলের সমাপ্তি হল।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৩/৩১/৪৪

নিজের পছন্দমতন শরীর লাভ

জীব তার বাসনা অনুসারে তার দেহ সৃষ্টি করে এবং ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি তাকে এমন একটি শরীর দান করেন যার দ্বারা সে

পূর্ণরূপে তার বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ পায়। বাঘ অন্য পশুর রক্ত খেতে ভালবাসে এবং তাই জড়া প্রকৃতি ভগবানের নির্দেশে তাকে অন্য পশুদের রক্ত খাওয়ার জন্য একটি বাঘের শরীর দান করেন।

—শ্রীমদ্ভাগবত ২/৯/২

মৃত্যুর অর্থ অতীত জীবন ভুলে যাওয়া

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেরই সেই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। মৃত্যুর পর মানুষ বর্তমান শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুর কথা ভুলে যায়, তার কিছুটা অনুভব আমাদের হয় রাত্রে ঘুমানোর সময়। যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, তখন দেহ এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুর কথা আমরা ভুলে যাই, যদিও সেই বিস্মৃতি সাময়িক—কেবলমাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য। মৃত্যু কয়েক মাস ব্যাপী নিদ্রা ছাড়া আর কিছু নয়, যার মাধ্যমে কোন একটি শরীরের বন্ধন সূচিত হয় এবং সেই শরীরটি আমরা লাভ করি আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে প্রকৃতির দানরূপে। তাই এই শরীরের অবস্থানকালে আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এই শিক্ষা জীবনের যে কোনও স্তরে লাভ করতে শুরু করা যায়, এমনকি মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও শুরু করা যায়। তবে সাধারণ পন্থা হচ্ছে জীবনের প্রাথমিক স্তর থেকেই এই শিক্ষা শুরু করা।

—শ্রীমদ্ভাগবত ২/১/১৫

আত্মা সর্বপ্রথম মনুষ্য জন্ম লাভ করে

মূলত জীব চিন্ময়, কিন্তু সে যখন জড় জগৎকে উপভোগ করতে চায়, তখন সে অধঃপতিত হয়। আমরা বুঝতে পারি যে, জীব প্রথমে মনুষ্য-শরীর ধারণ করে এবং তারপর তার জঘন্য কার্যকলাপের ফলে

সে ক্রমশ অধঃপতিত হয়ে, নিম্নতর জীবদেহরূপে পশু, বৃক্ষ, জলচর ইত্যাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। ক্রমবিবর্তনের ফলে জীব পুনরায় মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়ে সংসারচক্র থেকে উদ্ধার লাভের একটি সুযোগ পায়। কিন্তু সেই সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে যদি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, তাহলে তাকে পুনরায় বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৪/২৯/৪

পুনর্জন্মের বিজ্ঞান আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের অজানা

দেহান্তরের এই বিজ্ঞান আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকরা এই বিষয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে চায় না, কারণ তারা যদি এই সূক্ষ্ম বিষয়টি এবং জীবনের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করে, তাহলে তারা দেখতে পাবে যে, তাদের ভবিষ্যত গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৪/২৮/২১

পুনর্জন্মের অবহেলা ভয়ঙ্কর

আধুনিক সভ্যতা পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং অতি উন্নত সুযোগ-সুবিধার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাই অবসর গ্রহণের পর সকলেই আসবাবপত্রের দ্বারা সুসজ্জিত এবং সুন্দরী রমণী এবং শিশুদের দ্বারা পরিবৃত গৃহে অত্যন্ত আরামদায়কভাবে জীবন যাপন করতে চায়। সেই আরামদায়ক গৃহটি থেকে চলে যাওয়ার কোন বাসনা তাদের থাকে না। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং মন্ত্রীরা মৃত্যু পর্যন্ত তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত পদটি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে এবং স্বপ্নেও তারা তাদের সেই গৃহসুখ থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। সেই মোহের বন্ধনে আবদ্ধ

হয়ে জড় বিষয়াসক্ত মানুষরা অধিকতর আরামদায়ক আরেকটি জীবনের জন্য নানাপ্রকার পরিকল্পনা করে, কিন্তু নিষ্ঠুর মৃত্যু নির্দয়ভাবে সেই সমস্ত বড় বড় পরিকল্পনাকারীদের বর্তমান শরীরটি ত্যাগ করে অন্য আরেকটি শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এই সমস্ত পরিকল্পনাকারীদের এইভাবে তাদের কৃতকর্মের ফল অনুসারে চুরাশী লক্ষ বিভিন্ন যোনীর মধ্যে একটি শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়।

যে সমস্ত মানুষ তাদের পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের সাধারণত কর্মের ফল অনুসারে নিম্নস্তরের শরীর দান করা হয় এবং এইভাবে মানবজীবনের সমস্ত শক্তির অপচয় হয়। মানবজীবনের অপচয়ের বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এবং অলীক বস্তুর প্রতি আসক্ত না হওয়ার জন্য মানুষকে পঞ্চাশ বছর বয়স হলে সাবধান হওয়া উচিত, আর তার পূর্বেই যদি তা করা হয় তাহলে আরও ভাল। সকলের জানা উচিত যে মৃত্যুর ভয় সর্বদাই বর্তমান, এমনকি পঞ্চাশ বছর বয়সের পূর্বেও মৃত্যু আমাদের গ্রাস করতে পারে। তাই জীবনের যেকোনও অবস্থায় পরবর্তী শ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত।

—শ্রীমদ্ভাগবত ২/১/১৬

ধূলার শরীর ধূলায় মিশে যাবে

আমরা যখন মরে যাই, মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ—এই পঞ্চ উপাদানে গঠিত জড় দেহটি পচে যায় এবং সামগ্রিক জড় বস্তুগুলি উপাদানসমূহে ফিরে যায়। খ্রিষ্টানদের বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে "ধূলায় নির্মিত তুমি, তোমাকে ধূলায় ফিরে যেতে হবে।" কোন কোন সমাজে দেহটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, কোন কোন সমাজে তা সমাধিস্থ করা হয় এবং অন্যান্য কেউ তা পশুর কাছে ছুঁড়ে দেয়। তারতে হিন্দুগণ দেহটি পুড়িয়ে ফেলে আর এইভাবে দেহটি ছাইয়ে

মায়াবদ্ধ জড়জাগতিক মানুষেরা আরও আরামদায়ক জীবনের জন্য কত বিভিন্ন পরিকল্পনার প্রস্তুতি গ্রহণ করে, কিন্তু সহসা নিষ্ঠুর মৃত্যু এসে ক্ষমাহীনভাবে সেইসব বড় বড় পরিকল্পনাকারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাদের হরণ করে

রূপান্তরিত হয়। ছাই কেবলমাত্র মাটির অন্য একটি রূপ খ্রিষ্টানগণ দেহটি সমাধিস্থ করে এবং কিছুকাল পরে সমাধিতে দেহটি ধীরে ধীরে ধূলায় পরিণত হয়, যা পুনরায় ছাইয়েরই মতো মাটির আরেকটি রূপ। অন্য আরও সমাজ রয়েছে—যেমন ভারতের পার্শি সম্প্রদায়গণ—তারা দেহটিকে না পোড়ায়, না সমাধিস্থ করে তারা দেহটিকে শকুনের কাছে নিক্ষেপ করে এবং শকুনেরা দেহটি ভক্ষণ করার জন্য তৎক্ষণাৎ চলে আসে আর তখন দেহটি ফলস্বরূপ বিষ্ঠায় রূপান্তরিত হয়। তো যে কোন ক্ষেত্রেই এই সুন্দর দেহটি, যাকে আমরা সাবান দিয়ে ঘষছি এবং কত সুন্দরভাবে যত্ন করছি, তা অবশেষে বিষ্ঠা কিম্বা ছাই অথবা ধূলায় পরিণত হবে মৃত্যুর সময় সূক্ষ্ম উপাদানসমূহ (মন, বুদ্ধি ও অহংকার) আত্মার সঙ্গে বাহিত হয়ে কারোর কর্ম অনুসারে অন্য একটি দেহে দুঃখ অথবা সুখ ভোগ করার জন্য দেহান্তরিত হয়

—যোগসিদ্ধি

জ্যোতিষ এবং পুনর্জন্ম

জীবের ওপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের জ্যোতিষ গণনা কোন কল্পনা নয়, তা বাস্তব সত্য, যা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপন্ন হয়েছে প্রতিটি জীবই প্রতিক্ষণ প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ঠিক যেমন একজন নাগরিক রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজ্যের আইন স্থূলরূপে পালন করা হয়, কিন্তু জড়া প্রকৃতির আইন আমাদের স্থূল বুদ্ধির এবং অনুভূতির তুলনায় সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায় না

জড়া প্রকৃতির নিয়ম এতই সূক্ষ্ম যে দেহের প্রতিটি অঙ্গ বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের দ্বারা প্রভাবিত এবং জীব তাঁর কারাগারের মেয়াদ পূর্ণ করার জন্য গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তার দেহ প্রাপ্ত হয় তাই মানুষের জন্মকালে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের দ্বারা তার

ভবিষ্যত সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় এবং অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা তার সঠিক ঠিকুজি তৈরী করতে পারেন। এটি একটি মহান বিজ্ঞান এবং তার যদি অপব্যবহার হয়, তার ফলে সেই বিজ্ঞানটি কিন্তু নিরর্থক হয়ে যায় না।

গ্রহ নক্ষত্রের এই প্রভাব মানুষের ইচ্ছার দ্বারা কখনও আয়োজন করা যায় না, পক্ষান্তরে ভগবানের উন্নত ব্যবস্থাপনার দ্বারা তা নির্ধারিত হয়। নিঃসন্দেহে জীবের সৎ ও অসৎ কর্ম অনুসারে সেই আয়োজন হয়, তা থেকে জীবের শুভ কর্মের গুরুত্ব বোঝা যায়। পুণ্য কর্মের প্রভাবে জীব কেবল সম্পদ, সুশিক্ষা ও সুন্দর রূপ প্রাপ্ত হয়

—শ্রীমদ্ভাগবত ১/১২/১২

(সম্পাদকের মন্তব্য : এখানে "অভিজ্ঞ জ্যোতিষী" কথাটি বলতে কেবলমাত্র জ্যোতিষের বিস্তৃত বৈদিক জ্ঞানে পূর্ণরূপে বিজ্ঞ জ্যোতিষীগণের কথা বলা হয়েছে তুলনায় আধুনিক জনপ্রিয় জ্যোতিষচর্চা হচ্ছে ভুলে ভরা আবেগনির্ভর মূর্খের অনুশীলন মাত্র।)

আপনার ভাবনাই আপনার পরবর্তী দেহ সৃষ্টি করে

আকাশের যে সূক্ষ্ম রূপ রয়েছে তা টেলিভিশনের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং আকাশতত্ত্বের ক্রিয়ার দ্বারা রূপ বা ছবিকে একস্থান থেকে আরেক স্থানে প্রেরণ করা যায়। *ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং বহিরন্তরমেব চ*, এই শ্লোকটি এক মহান বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ আধার, কেননা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিভাবে আকাশ থেকে সূক্ষ্ম রূপের উৎপত্তি হয়, তাদের লক্ষণ এবং কার্য কি প্রকার এবং কিভাবে বায়ু, অগ্নি, জল এবং মাটি—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানগুলি সূক্ষ্ম রূপ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মনের ক্রিয়া বা চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা এইগুলিও আকাশের স্তরের কার্যকলাপ, ভগবদ্গীতার বাণী অনুসারে, মৃত্যুর সময়ে যেই প্রকার

মানসিক স্থিতি হয়, তার ভিত্তিতে পরবর্তী জন্মলাভ হয়, তাও এই শ্লোকে সমর্থিত হয়েছে। সূক্ষ্ম রূপ থেকে স্থূল উপাদানে পর্যবসিত হওয়ার ফলে কিংবা জড়-জাগতিক কলুষের ফলে, সুযোগ পাওয়া মাত্রই মানসিক স্তরের ঘটনাসমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তরে রূপান্তরিত হয়।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৬/৩৪

কেন কিছু মানুষ পুনর্জন্মকে গ্রহণ করতে পারে না

মৃত্যুর পর আবার জীবন শুরু হয় এবং বার বার জন্ম-মৃত্যুময় ভব সংসার আবর্ত থেকে উদ্ধারের উপায় রয়েছে এবং শাশ্বত, অমর জীবন প্রাপ্তির সুযোগ আছে। কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে দেহান্তরিত হতে অভ্যস্ত হওয়ায় আমাদের পক্ষে শাশ্বত অনন্ত জীবনের অস্তিত্ব চিন্তা করা কঠিন। আমাদের এই সংসার জীবন এমন ক্লেশময় যে, এক শাশ্বত, অনন্ত জীবনের সম্ভাবনা চিন্তা করলে, সেই জীবনও অবশ্যই দুঃখময় বলে মনে হবে। যেমন একজন রুগ্ন ব্যক্তি যে শয্যাশায়ী হয়ে তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করছে, সে সেখানে আহার্য গ্রহণ করে এবং মলমূত্র ত্যাগ করে সে চলাফেরায় অক্ষম হয়ে, জীবনকে দুর্বিসহ বিবেচনা করে মনে মনে আত্মহত্যা করার চিন্তা করে। সেইরকম সংসার জীবন এমন দুঃখতাপময় যে, ভবরোগী হতাশাচ্ছন্ন হয়ে কখনও কখনও শূন্যবাদ বা নির্বিশেষবাদ গ্রহণপূর্বক নিজ অস্তিত্বের বিনাশ সাধন করে সব কিছুকেই শূন্য করতে প্রয়াসী হয়। বস্তুত শূন্য হওয়া সম্ভব নয়। শূন্য হওয়ার প্রয়োজনও নেই। মায়াবদ্ধ অবস্থায় আমরা বিপন্ন, কিন্তু ভব-বন্ধন মুক্ত হওয়া মাত্র আমরা আমাদের প্রকৃত জীবন বা সনাতন জীবনের সন্ধান পাই।

—কুন্তীদেবীর শিক্ষা

মাত্র আর কয়েকটি বছর!

এই শরীরকে সুখী অথবা দুঃখী বানাবার জন্য যে কার্য করা হয়, তার সমষ্টি হচ্ছে কর্ম। আমরা বাস্তবিকভাবে দেখছি যে মৃত্যুর সময় কোন মানুষ ডাক্তারকে অনুরোধ করছে তিনি যেন তাকে আরও চার বছর বেঁচে থাকার সুযোগ দেন, যাতে সে তার পরিকল্পনাগুলি সম্পন্ন করতে পারে। তা থেকে বোঝা যায় যে, মৃত্যুর সময় সে তার পরিকল্পনাগুলি চিন্তা করছিল। দেহের বিনাশের পর সে নিঃসন্দেহে মন, বুদ্ধি এবং অহংকার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা তার পরিকল্পনাগুলিকে তার সঙ্গে নিয়ে যায়। এইভাবে সে অন্তর্যামী পরমাত্মার কৃপায় আর একটি সুযোগ পায়।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৪/২৯/৬২

শল্যচিকিৎসা ব্যতীত লিঙ্গ পরিবর্তন

মৃত্যুর সময় মানুষ যেকথা চিন্তা করে, সেই অনুসারে সে তার পরবর্তী জীবন লাভ করে। কেউ যদি তার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সে তার মৃত্যুর সময় স্ত্রীর কথা চিন্তা করে এবং পরবর্তী জীবনে সে একটি স্ত্রী-শরীর ধারণ করে। তেমনই, কোন স্ত্রী যদি তার মৃত্যুর সময় তার স্বামীর কথা চিন্তা করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে সে তার পরবর্তী জীবনে পুরুষের শরীর লাভ করবে।

ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুসারে, আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম দুই প্রকার জড় শরীরই হচ্ছে পোশাকের মতন। সেইগুলি জীবের শার্ট ও কোটের মতন। স্ত্রী হওয়া বা পুরুষ হওয়া কেবল পোশাকের ভেদ মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩/৩১/৪১

স্বপ্ন এবং অতীত জীবন

স্বপ্নে আমরা কখনও কখনও এমন কিছু দেখি, যার অভিজ্ঞতা বর্তমান শরীরে কখনও হয়নি। কখনও কখনও স্বপ্নে আমরা দেখি যে, আমরা আকাশে উড়ছি, যদিও ওড়ার কোনও অভিজ্ঞতা আমাদের নেই তার অর্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী কোনও জীবনে দেবতারূপে অথবা মহাকাশচারীরূপে আমরা আকাশে বিচরণ করেছি মনের মধ্যে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে এবং হঠাৎ তার প্রকাশ হয়। তা জলের গভীরে বুদ্বুদের মতো, যা একসময় জলের উপরিভাগে প্রকাশ পায় কখনও কখনও স্বপ্নে আমরা এমন কোন স্থান দর্শন করি, যা এই জীবনে কখনও আমরা দেখিনি। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী জীবনে সেই স্থানের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল। মনের স্মৃতিপটে তা সঞ্চিত থাকে এবং স্বপ্নে অথবা চিন্তায় কখনও কখনও প্রকাশিত হয় অর্থাৎ মন হচ্ছে পূর্ববর্তী জীবনের বিভিন্ন চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। এইভাবে, পূর্ববর্তী জীবন থেকে এই জীবনে এবং এই জীবন থেকে পরবর্তী জীবনে এক ধারাবাহিকতা থাকে।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৪/২৯/৬৪

গভীর সংজ্ঞাহীনতা ও পরবর্তী জীবন

জড় কার্যকলাপে মগ্ন জীব জড় দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে এমনকি, মৃত্যুর সময়ও সে তার শরীর এবং শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের কথা চিন্তা করে। তার ফলে সে দেহাত্মবুদ্ধিতে এতই মগ্ন থাকে যে, মৃত্যুর সময়ও সে তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করতে চায় না কখনও কখনও দেখা যায় যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তি দেহত্যাগ করার পূর্বে বহুদিন গভীর সংজ্ঞাহীনতা অবস্থায় থাকে

কোন ব্যক্তি একজন প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতির শরীর উপভোগ করতে পারে, কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে যে, তাকে একটি কুকুর অথবা শূকরের শরীর গ্রহণ করতে হবে, তখন সে তার বর্তমান শরীরটি পরিত্যাগ করতে চায় না। তাই সে মৃত্যুর পূর্বে বহুদিন মূর্ছিত বা গভীর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকে

—শ্রীমদ্ভাগবত ৪/২৯/৭৭

ভূত এবং আত্মহত্যা

আত্মহত্যা আদি গর্হিত পাপ আচরণের ফলে ভূতের স্থূল জড় শরীর থেকে বঞ্চিত হয়। মানব সমাজে যারা ভূতেদের মতন চরিত্র বিশিষ্ট, তাদের অন্তিম উপায় হচ্ছে ভৌতিক অথবা আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করা ভৌতিক আত্মহত্যার ফলে জড় দেহের হানি হয়, আর আধ্যাত্মিক আত্মহত্যার ফলে সবিশেষ সত্তার লোপ হয়।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৩/১৪/২৪

শরীর পরিবর্তন : মায়ার প্রতিফলন

চন্দ্র একটি এবং এক স্থানে স্থির রয়েছে, কিন্তু জল অথবা তেলে তার প্রতিবিম্ব বিভিন্ন আকার ধারণ করছে বলে মনে হয়, বিশেষ করে যখন সেই জল অথবা তেল বায়ুর দ্বারা কম্পিত হয় তেমনই আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে বিভিন্ন শরীর ধারণ করে কখনও দেবতারূপে, কখনও মনুষ্যরূপে, কখনও একটি কুকুররূপে এবং কখনও একটি বৃক্ষরূপে সে বিভিন্ন শরীর ধারণ করে ভগবানের দৈবীমায়ার প্রভাবে জীব মনে করে যে, সে আমেরিকান, ভারতীয়, কুকুর, বিড়াল, বৃক্ষ ইত্যাদি একেই বলে মায়া, কেউ যখন এই মায়ার থেকে মুক্ত হয় এবং

হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, আত্মা এই জড় জগতের কোনও রূপের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তখন সে আধ্যাত্মিক স্তরে (ব্রহ্মভূত) অধিষ্ঠিত হয়।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১/৪৩

রাজনীতিকরা তাদের দেশেই পুনর্জন্ম লাভ করে

মৃত্যুর সময় প্রতিটি জীবই চিন্তা করে, তার পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের কি হবে, তেমনই রাজনীতিবিদেরাও চিন্তা করে, তাদের দেশের এবং রাজনৈতিক দলের কি অবস্থা হবে রাজনীতিবিদ ও তথাকথিত জাতীয়তাবাদীরা, যারা তাদের জন্মভূমির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা অবশ্যই তাদের জীবনান্তে পুনরায় সেই দেশেই জন্মগ্রহণ করবে মানুষের এই জীবনের কর্মের দ্বারা তার পরবর্তী জীবন প্রভাবিত হয় কখনও কখনও রাজনীতিবিদরা তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য অত্যন্ত জঘন্য পাপকর্ম করে বিরোধী দলের কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয় রাজনীতিবিদেরা যদি তাদের তথাকথিত মাতৃভূমিতে জন্মগ্রহণ করেও, তবু তাদের পূর্বজন্মের পাপকর্মের ফলে, নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়

—শ্রীমদ্ভাগবত ৪/২৮/২১

পশুহত্যায় ভুলটা কোথায়?

অহিংসা অর্থ হচ্ছে কোন জীবের জীবনের ক্রমোন্নতি রোধ না করা কারও এটি মনে করা উচিত নয় যে, দেহকে হত্যা করলেও যখন আত্মার বিনাশ হয় না, তখন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য পশুহত্যা করলেও কোন ক্ষতি নেই। যথেষ্ট পরিমাণে শস্য, ফল এবং দুধ থাকা সত্ত্বেও এখনকার মানুষরা পশুমাংস আহারে আসক্ত পশুহত্যা করার কোনও প্রয়োজনই নেই বিবর্তনের মাধ্যমে পশুরাও এক পশুদেহ থেকে অন্য পশুদেহে দেহান্তরিত হয়ে এগিয়ে চলেছে যদি কোনও এক বিশেষ পশুকে হত্যা করা হয়, তবে তার প্রগতি বাধা প্রাপ্ত হয়। কোন পশুর যখন কোন নির্দিষ্ট শরীরে কোন নির্দিষ্ট কাল অবস্থানের মেয়াদ থাকে, তখন যদি তাকে অপরিণত অবস্থায় হত্যা করা হয়, তা হলে তাকে বাকি সময়টি পূর্ণ করে উন্নততর প্রজাতিতে উন্নীত হওয়ার জন্য আবার সেই শরীর প্রাপ্ত হতে হয় সুতরাং, কেবলমাত্র জিহ্বার তৃপ্তির জন্য ওদের প্রগতি রোধ করা উচিত নয়

—ভগবদ্‌গীতা ১৬ ১-৩

বিবর্তন : বিভিন্ন জীব সত্তার মাধ্যমে আত্মার অভিযান

আমরা নানা আকৃতির দেহরূপ দেখেছি। কোথা থেকে এত বিভিন্ন রূপ আকৃতি আসে? কুকুরের আকৃতি, বিড়ালের আকৃতি, গাছের আকৃতি, সরীসৃপের আকৃতি, পতঙ্গের আকৃতি, মাছের আকৃতি?

বিবর্তনের ফলে এরূপ হতে পারে, কিন্তু একই সময়ে সকল প্রকারের বিভিন্ন জীব অবস্থান করছে যেমন মাছ, মানুষ, বাঘ প্রত্যেকেই রয়েছে এটা যেন কোন শহরের বিভিন্ন ধরনের ঘর, বাড়ি, আবাসনের মতন। ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য অনুযায়ী এর যেকোনও একটিতে আপনি থাকতে পারেন, কিন্তু সব আবাসনগুলি একই সময়ে বিরাজ করছে। ঠিক তেমনই, কর্মফল অনুসারে জীবসত্তাকেও এইসব দেহরূপের কোনও একটি অধিকার করে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিবর্তনও একই সঙ্গে চলছে। মাছ থেকে পরবর্তী বিবর্তন হয়েছে বৃক্ষ গাছের আকৃতি থেকে জীবসত্তা পতঙ্গের আকৃতি লাভ করে থাকতে পারে পতঙ্গের শরীর থেকে পরবর্তী পর্যায়ে

পাখী, তারপরে পশু এবং অবশেষে চিন্ময় আত্মা মানব রূপে উপনীত হতে পারে। মানবরূপ থেকে যদি কেউ যোগ্য হয়ে ওঠে তবে সে আরও বিবর্তনের পথে এগোতে পারে। নতুবা তাকে অবশ্যই আবার বিবর্তনের চক্রে পুনঃপ্রবেশ করতে হবে। সুতরাং জীবসত্তার বিবর্তনমূলক বিকাশের প্রক্রিয়ায় মানবরূপ জীবন ধারা এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল।

—চেতনা ঃ হারানো সংযোগ

মায়ার বিভ্রম

সমুদ্রের ফেনা যেন ক্ষণে সৃষ্টি ক্ষণে লয়।
মায়ার সংসারে খেলা সেইভাবে হয়॥
কেহ নহে পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন।
সবাই ফেনার মতো থাকে অল্পক্ষণ॥
সমুদ্রের ফেনা যেমন সমুদ্রে মিশায়।
পঞ্চভূতের দেহ তথা হয়ে যায় লয়॥
কত দেহ এইভাবে ধরয়ে শরীরী।
অনিত্য শরীরে মাত্র আত্মীয় তাহারি॥

—'বৃন্দাবন ভজন'

(কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বাংলায় রচিত কবিতার অংশ।)

৬

পুনর্জন্মের যুক্তি

পৃথিবীর কলুষতার এবং যৌক্তিকতার ব্যাখ্যা হল পুনর্জন্মবাদ, একথা কি আপনার মনে হয়েছে? যদি আমাদের বিগত জন্মগুলির পাপকর্মের ফলে আমরা দুঃখ ভোগ করে থাকি তাহলে আমরা প্রাণপণে তা সহ্য করতে পারি এবং আশা করি যে এই জীবনে যদি আমরা ধর্মপথে অগ্রসর হই, আমাদের ভবিষ্যত জীবনগুলি কম দুঃখময় হবে।

—ডব্লু. সমারসেট মম
দ্য রেজর'স এজ

দুটি শিশু একই দিনে একই সময়ে জন্মাল। প্রথম শিশুটির মা-বাবা ধনী এবং সুশিক্ষিত। তারা সারা বছর ধরে তাদের এই প্রথম সন্তানটির জন্মের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন। আগ্রহের অবসানে তারা দেখলেন তাদের একটি সুন্দর, ফুটফুটে ছেলে জন্মেছে। ছেলেটির ভবিষ্যত ছিল উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়। নিশ্চয়ই তাদের ভাগ্য প্রসন্ন ছিল।

দ্বিতীয় শিশুটি পুরোপুরি একটি অন্য জগতে জন্ম নিল। সে তার মায়ের গর্ভে থাকাকালীন তার বাবা মাকে ছেড়ে চলে যায়। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় তার মা অতি কষ্টে তাকে বড় করে তোলে। তার সামনে ছিল অত্যন্ত কঠিন পথ। এই কঠিন পথের বাধা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে খুব সহজসাধ্য ছিল না।

একজন অতিভোজী বা পেটুক ব্যক্তি যে কোন বাছবিচার না করে বিরাট ও বিভিন্ন পরিমাণ খাদ্য ও পানীয় আকণ্ঠ ভোজন করে জড়া প্রকৃতি তাকে একটি শূকর বা ছাগলের দেহ দান করে।

জগৎটা এরকমই বৈষম্যে ভরা। এইসব বৈষম্য নানারকম প্রশ্নের সম্মুখিন করে আমাদের : "ভাগ্য কিভাবে এরকম বিরূপ হতে পারে?" জর্জ ও ম্যারির যে অন্ধ ছেলে জন্মাল, তারা কি দোষ করেছিল? প্রত্যেকেই আপাতদৃষ্টিতে ভাল তাই সকলেরই প্রশ্ন— ভগবান এত নির্দয় কেন?

প্রকৃতপক্ষে এটাই পুনর্জন্মের নীতি। যাতে করে মানুষ জীবনটাকে আরও উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনন্তকালের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটা বিশ্বাস জন্মায় যে জীবন বুঝি শুধু আমাদের অস্তিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এটি মহাকালের হিসাবে একটি ক্ষণমাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আপাতদৃষ্টিতে ধর্মপ্রাণ হলেও আমরা বুঝতে পারি প্রত্যেটি মানুষ তার ইহ জীবনে বা পূর্বজন্মের নানা অধার্মিক ফল ভোগের জন্যই এত কষ্ট পাচ্ছে বিশ্বজনিন সুবিচারের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা দেখতে পারি প্রত্যেক মানুষ তার নিজ কর্মফলের জন্য কতখানি দায়ি।

আমাদের কাজকর্মগুলিকে বীজের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে যেমন বীজকে প্রাথমিকভাবে মাটিতে পোঁতা হয় সময়ের সাথে সাথে সেই বীজ থেকে চারাগাছ তৈরী হয় চারাগাছ ক্রমে বড় হয় ও ফল উৎপন্ন করে।

একইভাবে আত্মা বহুজন্মের মধ্য দিয়ে তার পারমার্থিক গুণাবলী বিকশিত করে তুলতে পারে, যতক্ষণ না তাকে আর জড়দেহের মাধ্যমে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে চিন্ময় জগতে নিজ ধামে ফিরে যেতে পারে

মানবজীবনের এটাই বিশেষ আশীর্বাদ ইহজন্মে এবং পরজন্মে বিভিন্ন পাপকাজের ফলে দুর্গতি ভোগের জন্য মানবজন্ম দায়ী হলেও মানুষই পাবে এই জন্মে কৃষ্ণভাবনার পথ গ্রহণ করে তার কর্মসংস্কার করতে কারণ মানবদেহে আত্মা বিবর্তনের মধ্যান্তরে অবস্থান করে

এইজন্মেই জীব বেছে নিতে পারে সে পুনর্জন্মের অধঃপতনে পুনরায় প্রবেশ করবে নাকি পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি লাভ করবে

আইন বিধির অমোঘ ধারা অনুসারে একজন অপরাধীকে কারাবরণ করতেই হয় সেখানে আরেকজন মানুষ তার সেবাকর্মের শ্রেষ্ঠতার জন্য সর্বোচ্চ আদালতে বিচারকের আসনে বসতে পারেন। সেইভাবে পূর্বজন্ম ও ইহজন্মের কামনা বাসনা ও কাজকর্মের ভিত্তিতে আত্মাও তার নিজের গন্তব্য বেছে নেয় সেইমতন সে একটি শারিরীক রূপ লাভ করে। যার জন্য কেউ আক্ষেপ করে বলতে পারে না, 'আমি তো জন্মাতে চাইনি।' এই জড় জাগতিক পৃথিবীতে বারংবার জন্ম ও মৃত্যুর ব্যবস্থাতে 'মানুষ ভাবে এবং ভগবান সেরূপ ব্যবস্থা করেন'।

ঠিক যেমন নিজের প্রয়োজন ও ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে লোক বাছাই করে গাড়ি কেনে তেমনি নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও কাজকর্মের মাধ্যমে আমরা নিজেরাই ঠিক করে নিই পরজন্মে কি ধরনের শরীর জড়া প্রকৃতি আমাদের জন্য আয়োজন করে দেবে এই জড় শরীর আত্ম-উপলব্ধির জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু মূল্যবান এই মনুষ্যজন্মকে যদি কেউ শুধুমাত্র পশুদের মতন আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও সংগ্রামের মধ্যেই আবদ্ধ রাখা হয়। তবে ভগবান তাকে পরজন্মে সেই ধরনের ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য উপযুক্ত কোন একটি জীবের দেহ দান করবেন।

পুরস্কার এবং শাস্তির এই উদার ব্যবস্থাটিকে প্রথমে বিস্ময়কর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ভগবান সর্বমঙ্গলময়—এই ধারণাটি আমাদের মনে পরিষ্কার থাকলে বুঝতে পারব ব্যবস্থাটি অবশ্যই সমভাবাপন্ন ও যথাযথ। নিজের পছন্দ মতো ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য জীবের প্রয়োজন একটি উপযুক্ত শরীর। জীব যেমন শরীরের আকাঙ্ক্ষা করে সেইমতন প্রকৃতিও তাকে নির্দিষ্ট শরীর দান করে তার বাসনা পূরণ করে।

একটিমাত্র জীবনকালেই আমাদের ক্রিয়াকর্মের সব কিছু নির্ভর করে থাকে সেজন্য আমরা যদি পাপপূর্ণ বা অনৈতিক জীবন যাপন করি, তাহলে ঘোরতমসাময় নরকে অনন্তকালের নির্বাসনে আমরা দণ্ডিত হব -মুক্তির কোনও পথ নেই এই ধরনের একটি সর্বসাধারণের ভ্রান্তিবোধ পুনর্জন্মের স্বচ্ছযুক্তি দিয়ে খণ্ডিত হয়েছে বেশ বোঝা যায় স্পর্শকাতর ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানী মানুষরা এই ধরনের চরম বিচারের ব্যবস্থাকে ঈশ্বরপ্রদত্ত না বলে দানবিক বলেই মনে করে এটা কি সম্ভব, যে মানুষ অন্যদের প্রতি কৃপা বা অনুকম্পা দেখাতে পারে, কিন্তু ভগবান নির্দয়? এইরকম ধারণা ভগবানকে এক হৃদয়হীন পিতার মত উপস্থাপন করে, যেন তিনি তার সন্তানদের বিপথগামী হতে দেন, আর দূর থেকে তাদের অনন্ত শাস্তিভোগ ও মরণযন্ত্রণা লক্ষ্য করতে থাকেন

এই ধরনের অযৌক্তিক ধারণা ভগবান এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বহিঃ-প্রকাশস্বরূপ জীবদের মধ্যে যে অনন্ত প্রেমবন্ধন রয়েছে, সেই ভাবধারাকে অবহেলা করে মানুষ ভগবানের স্বরূপে সৃষ্টি হয়েছে— এই সংজ্ঞাটির দ্বারা বোঝায় যে সম্পূর্ণ সার্থকতার সকল গুণাবলী ভগবানের অবশ্যই আছে। এই গুণাবলীর অন্যতম হল কৃপা একটি ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরে যে মানুষ অনন্তকালের জন্য নরকবাসের শাস্তি ভোগ করতে পারে অনন্ত কৃপার অধিকারী পরম পুরুষের ধারণার সঙ্গে সেই মানুষের সামঞ্জস্য হয় না যেখানে একজন সাধারণ পিতা তার পুত্রের জীবন সার্থক করার জন্য একাধিক সুযোগ দিয়ে থাকেন সেখানে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই ওঠে না

বৈদিক শাস্ত্রগুলোতে বারেবারেই ভগবানের কৃপাময় সত্তার উচ্চপ্রশংসা করা হয়েছে যারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ্যে অপদস্থ করে তাদের প্রতিও তিনি কৃপাময়, কারণ তিনি প্রত্যেকের অন্তরে বিরাজ করেন এবং সকল জীবের স্বপ্ন ও আশা আকাঙ্ক্ষা সার্থক করে তোলার

৭
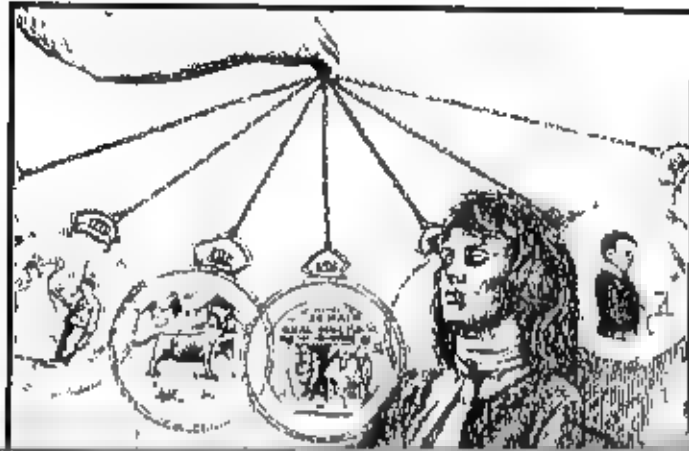
প্রায় পুনর্জন্ম

দেহধারী জীবের পূর্বকৃত কর্মের ফল এই জীবনে সমাপ্ত হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে এক শরীর প্রাপ্ত হয় এবং সেই শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মের প্রভাবে সে আর একটি শরীর তৈরী করে। এইভাবে সে তার [illegible]

আছে—সেটি চেতনা, অথবা আত্মা তবে এটা কিন্তু কোনও নতুন তথ্য নয় কারণ বহু বছর ধরেই এটা আমরা জানি

বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থে ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়েছে যে আত্মার একটি লক্ষণ হল চেতনা এইজন্য শরীর থেকে আত্মার একটি পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন ভগবদ্গীতা বা অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থ পড়লেই, শরীর থেকে পৃথক আত্মার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে মন, বুদ্ধি ও অহংকার দিয়ে আমাদের সূক্ষ্ম শরীর গঠিত স্বপ্ন বা প্রায় মৃত্যুর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এই সূক্ষ্ম শরীরের মাধ্যমে আত্মা কিছু সময়ের জন্য কক্ষ থেকে বাইরে যেতে পারে যিনি বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান পড়েছেন, তাঁর কাছে এইরকম ঘটনা কিন্তু বিস্ময়কর নয়।

আমরা সাধারণত শরীরটিকেই আত্মপরিচয় বলে মনে করি এটাই অহংকার। 'আমি'—এই ভাবটিই হল অহংকার। আত্মা যখন জড় জাগতিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয় তখন সে শরীরের সাথে আত্মপরিচয় বোধ করে। মনে করে সে এই জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি আত্মপরিচয়ের এই মনোভাবটি যখন বাস্তব সত্য তথা আত্মার উপলব্ধিতে প্রয়োগ করা হয়, তখন সেটিই হয় যথার্থ অহম বোধ

পুনর্জন্ম ঃ শরীর বহির্ভূত যথার্থ অভিজ্ঞতা

শরীর বহির্ভূত অভিজ্ঞতাগুলি নতুন কিছু নয় প্রত্যেকেরই এই অভিজ্ঞতা আছে প্রত্যেকেই স্বপ্ন দেখে, এই স্বপ্ন শরীর বহির্ভূত অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয় ঘুমের মধ্যে আমরা যখন স্বপ্ন দেখি বা স্বপ্নাবস্থায় প্রবেশ করি তখন আমাদের সূক্ষ্ম দেহটি (মন, বুদ্ধি ও অহংকার সমন্বিত) স্থূল আকৃতি পরিত্যাগ করে এবং সূক্ষ্ম পর্যায়ের এক ভিন্ন অস্তিত্ব উপভোগ করে এটিই হল শরীর বহির্ভূত অভিজ্ঞতা। মৃত্যুর সময় আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে অন্য নতুন শরীরে যা নিয়ে যায় এই সূক্ষ্ম শরীরটি তারই মাধ্যম এটিই আত্মাকে বহন করে

শরীর বহির্ভূত অভিজ্ঞতার একটি বেশ সুপরিচিত ধরণ বোঝা যায় প্রায় মৃত্যুর ঘটনাগুলোর মধ্যে কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বা অপারেশন টেবিলের ওপর যখন কোনও ব্যক্তির তার শরীরটিকে শূন্যে ভাসছে বলে বোধ হয় সেক্ষেত্রে তার কোনও রকম শারিরীক বেদনা বা অস্বস্তি থাকে না যদি অনেক ক্ষেত্রে এইরকম প্রায় মৃত্যু অবস্থা কে চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে

প্রকৃতপক্ষে স্থূল শরীরটি নিষ্ক্রিয় থাকলেও সূক্ষ্ম শরীরটি সক্রিয় থাকে আগেই বলা হয়েছে, আমাদের স্থূল শরীরটি যখন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে তখন সূক্ষ্ম শরীরটি আমাদের স্বপ্নের মধ্যে নিয়ে যায় আবার একই ঘটনা ঘটে যখন আমরা দিনের বেলায় দিবাস্বপ্নের মতন মানসিকভাবে ভ্রমণ বিহারে চলে যাই

বিশেষ পরিস্থিতিতে, মৃত্যুর প্রায় কাছাকাছি আসার সময়, মানুষ একটি অবস্থার মধ্যে চলে আসে, গবেষকরা থাকে 'প্রায় মৃত্যুর' অভিজ্ঞতা বলে থাকেন কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রায় মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ও শরীর বহির্ভূত অভিজ্ঞতাকে একই বলে মনে করা হয় প্রায় মৃত্যুর অভিজ্ঞতায়, সূক্ষ্ম শরীর অনেক সময় জড় শরীর রূপটির ওপর শূন্যে ভেসে থাকে যেহেতু আত্মা জীবনের মূল প্রাথমিক তত্ত্ব—জীবনেরই যথার্থ সারতত্ত্ব -তাই সেটি যে শরীরের অন্তর্গত সেই শরীরটিকে সে লক্ষ্য করতে পারে। ঠিক যেভাবে শরীরের সমস্ত দেহগত গুণবৈশিষ্ট্যগুলিকে আত্মা দেখতে পায়, শুনতে পারে এবং তার ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে

যখন সূক্ষ্ম শরীর প্রায় মৃত্যুর অবস্থার সময় স্থূল শরীরের ওপর ভাসতে থাকে, তখন শরীরটিকে ইঞ্জিন ছাড়া চলমান একটি গাড়ির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যে গাড়ির চালক মুহূর্তের জন্য বেরিয়ে এসেছে কিন্তু যদি সেই চালক আর ফিরে না যায়, তবে একসময় গাড়িটির চলৎশক্তি ফুরিয়ে যায় ইঞ্জিন টি বন্ধ হয়ে যায়

ঠিক তেমনই, প্রায় মৃত্যুর অবস্থায় আত্মা যদি ফিরে এসে শরীরের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত না করে, তবে সেই মানুষটি মারা যায়। সূক্ষ্ম শরীরটি তখন সেই আত্মাকে নতুন জীবন শুরু করার জন্য অন্য একটি শরীরে নিয়ে চলে যায়।

বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে এই বিষয়টি (আত্মা) নিয়েই মূলত আলোচনা করা হয়েছে। ভগবদ্গীতার একটি অতি প্রখ্যাত ও বহুবার উদ্ধৃত একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—দেহীর দেহ যেভাবে কৌমার, যৌবন ও জরার মাধ্যমে তার রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" (ভগবদ্গীতা ২/১৩)

আমাদের জীবনকালে আমরা অজ্ঞাতভাবেই নিজেদের পরজন্মের সূক্ষ্মরূপটি সৃষ্টি করে থাকি। ঠিক যেভাবে শুঁয়োপোকা একটি পাতা ছেড়ে দেওয়ার আগেই আরেকটি পাতায় চলে যায়, জীবসত্তাও বর্তমান রূপটি পরিত্যাগের আগেই তার নতুন দেহরূপ সৃষ্টি করতে শুরু করে দেয়। যথার্থ মৃত্যুর মুহূর্তে আত্মা তার পূর্ববর্তী আবাসন স্বরূপ শরীরটিকে প্রাণহীন করে দিয়ে নতুন শরীরে প্রবেশ করে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আত্মার কোনও শরীরের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব বিনা শরীর নিতান্তই একটি মরদেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। দেহ থেকে দেহান্তরিত আত্মার এই বিচরণকেই আমরা পুনর্জন্ম বলে থাকি।

যদিও প্রায় মৃত্যুর ঘটনার শত শত বিবরণ থেকে যথার্থভাবে বোঝা যায় যে শরীর ভিন্ন মন ও আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে। কিন্তু তাসত্ত্বেও প্রায়-মৃত্যুর ঘটনাগুলি থেকে আমরা মৃত্যুর সময়ে আত্মার চরম গন্তব্য সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাই না। প্রায় মৃত্যু অভিজ্ঞতা পুনর্জন্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে থাকে। কিন্তু পুনর্জন্মের

যথার্থ প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে নিতান্তই অজ্ঞ করে রাখে। মৃত্যুর পরে আত্মা কোথায় যাচ্ছে—সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানায় না।

সম্মোহনের মাধ্যমে পূর্বস্মৃতি জাগরণ পরিপূর্ণ তত্ত্ব প্রদান করে না

পুনর্জন্ম সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গ্রন্থ রয়েছে। যেগুলিতে সম্মোহনের মাধ্যমে পূর্বস্মৃতি জাগরণের বিভিন্ন ঘটনার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। সেইসব ঘটনায় দেখা গেছে সম্মোহিত ব্যক্তিরা তাদের পূর্বজন্মের বিশদ বিবরণ স্মরণ করতে পারছেন। এরকমই একটি বই 'দ্য সার্চ ফর ব্রিডী মারফি'। ১৯৫০ সালে এই বইটি প্রচুর বিক্রি হয়েছিল। ৫০টিরও বেশী সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে এই বইটির বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয়েছিল। বইগুলি সেইসময় সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরিয়ে আনা সম্বন্ধীয় এই ধরনের পেপারব্যাক গ্রন্থগুলি এক নতুন ভাবধারার সৃষ্টি করেছিল। যা পরবর্তী দশকগুলিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই ধরনের বইগুলি আজও বিশেষ জনপ্রিয়। কিন্তু পুনর্জন্ম সম্পর্কিত এইসব সাহিত্য প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ভাসাভাসা কিছু তত্ত্বের অবতারণা করে থাকে মাত্র, একটি বিশাল তত্ত্বজ্ঞানের সামান্য কিছু অংশ আমাদের নজরে নিয়ে আসে। বিভিন্নভাবে যা আমাদের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

'দ্য সার্চ ফর ব্রিডী মারফির' লেখক একজন সুদক্ষ সম্মোহনবিদ। তিনি মধ্যবয়সী আমেরিকান রোগিনী ভার্জিনিয়া টিঘেকে তার গতজন্মের পূর্বস্মৃতি স্মরণ করাতে পেরেছিলেন। যেখানে ঐ মহিলা দাবী করেছিলেন যে তিনি পূর্বজন্মে আয়ারল্যান্ডে ছিলেন। সেখানে ১৭৭৮ সালে জন্মেছিলেন। তাঁর নাম ছিল ব্রিডি মারফি

আয়ারল্যাণ্ডেই তিনি তার জীবন কাটিয়েছিলেন ৬৬ বছর বয়সে বেলফাস্টে মারা যান

সম্মোহিত অবস্থায় শ্রীমতী তিঘে, ব্রিডির শৈশবকালের যাবতীয় ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলেন। ব্রিডির বাবা মা'র নাম, আত্মীয় স্বজনদের নাম এবং তার পূর্বজন্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বিবৃত করেন বইটিতে বলা হয়েছিল যে ব্রিডি মৃত্যুকালে চিন্ময় জগতে প্রবেশ করেছিলেন। যাতে ১৯২৩ সালে ভার্জিনিয়া তিঘে হয়ে আমেরিকায় আবার জন্ম লাভ করতে পারেন

ব্রিডি মারফি সম্বন্ধে তিঘে যেসব কথা বলেছিলেন তার কিছু তথ্যাবলি অনুসন্ধানকারিরা যাচাই করে দেখেছিলেন কিন্তু তারা সম্মোহিত অবস্থায় শ্রীমতি তিঘে ব্রিডি মারফির যে শৈশব অবস্থার কথা বলেছিলেন তার সাথে শ্রীমতী তিঘের নিজের শৈশব অবস্থার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন যেমন গবেষণায় দেখা গিয়েছিল তিঘে চার বছর বয়সে ব্রিডি মারফি নামে তাঁর এক কাকীমার সাথে রাস্তার অপর প্রান্তে থাকত যার ফলে তিঘে বর্ণিত এই ব্রিডি মারফির ঘটনাটির সত্যতা এখনও বিতর্কিত এবং যুক্তিতর্কে জর্জরিত রয়েছে।

এইরকম আরও অনেক ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিগত জন্মের স্মৃতি বিষয়ক এইরকম ঘটনাগুলি উক্ত ব্যক্তির শৈশব অবস্থার ঘটনাও হতে পারে যেসব মনোবিজ্ঞানীরা এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন তারা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে সম্মোহিত অবস্থায় মানুষ তাদের 'পূর্বজন্ম' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য যে ঘটনা বিবৃত করে তা কাল্পনিক কাহিনী মাত্র। তবে একথাও বলা যায় না যে সম্মোহনের মাধ্যমে লব্ধ পূর্বজন্ম' সম্পর্কিত সব বিবরণই কাল্পনিক কিন্তু অচেতন অবস্থায় কল্পনাবিলাস থেকে যথার্থ স্মৃতিচারণকে পৃথক করতে হলে প্রচুর উদ্যোগ আয়োজন প্রয়োজন। যা প্রায়ই সম্ভব হয় না।

সম্মোহনের মাধ্যমে বিবৃত গতজন্মের শৈশব স্মৃতিগুলিই শুধুমাত্র ভুল হয় না, শৈশবে শোনা নানা গল্পকথা, অতীতে পড়া বই বা কাল্পনিক ঘটনাবলী অনায়াসেই অতীত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে যায় এবং ভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাই সম্মোহনের মাধ্যমে বিবৃত পূর্বজন্ম সম্পর্কিত ঘটনাগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়।

ইহজন্ম ও বিগতজন্মের মাঝে একটি বিশাল ছেদ থাকে এই ছেদ বিগতজন্মের স্মৃতি স্মরণের ক্ষেত্রে দারুণ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যেমন আগের যে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ভার্জিনিয়া বিগতজন্মে নিজেকে ব্রিডি মারফি বলে উল্লেখ করেছে এবং বলেছে যে সে গতজন্মে ১৮৬৪ সালে মারা গিয়েছিলেন সেক্ষেত্রে ভার্জিনিয়া তিঘে রূপে তার পুনর্জন্মের মাঝে প্রায় ষাট বছরের ব্যবধান ছিল বইটিতে বলা হয়েছে যে এই সময়ের মধ্যে ব্রিডি মারফির আত্মা 'চিন্ময় জগতে' বাস করছিল

বেদে পুর্বজন্মের নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পুনর্জন্মের যথার্থ প্রক্রিয়াটি হল মৃত্যুকালে একটি জড়দেহ পরিত্যাগ করে আত্মা জড়া প্রকৃতির ব্যবস্থা অনুসারে এই বিশ্বে অথবা অন্য কোনও মহাবিশ্বে জন্ম নেয় সেখানে কোনও একটি জীবরূপে সেই প্রজাতির অন্য এক গর্ভে প্রবেশ করে। মৃত্যুর পরে আত্মা দেহের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসে সে তখন মনের গতিতে বিচরণ করতে পারে। এই কারণে একটি দেহ থেকে বেরিয়ে অন্য একটি দেহে প্রবেশের জন্য আত্মার খুবই কম সময় লাগে অবশ্য যে সব আত্মা আত্মতত্ত্বজ্ঞানী তারা পুনর্জন্মের এই চক্র থেকে বেরিয়ে যায়। তারা চিন্ময় জগৎ লাভ করে কিন্তু জড় জাগতিক জীবনে আবদ্ধ সাধারণ আত্মার পক্ষে তা সম্ভব নয় যদিও যথাযথ আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে প্রত্যেক আত্মাই চিন্ময় জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা রাখে সুতরাং এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সম্মোহনের মাধ্যমে পূর্বজন্মের স্মৃতিচারণের

ক্ষেত্রে যে বলা হচ্ছে ইহজন্ম ও বিগতজন্মের মাঝে যে বিস্তর ছেদ থাকে তা সম্পূর্ণ অবাস্তব

ভগবদ্‌গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'হে অর্জুন যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন " কিন্তু ভগবান পরে এও বলেছেন, 'মহাত্মা, ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তাঁরা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন।"

কর্ম ও পুনর্জন্ম সম্পর্কিত বিধানগুলি খুব সুচারুভাবে নির্দিষ্ট আছে যেকোনও জড় দেহের মৃত্যু হলেই আত্মার পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে প্রকৃতি একটি জড়দেহের আয়োজন করে রাখে যার মধ্যে বিগত আত্মা প্রবেশ করে নবজন্ম লাভ করে।

"অন্তিমকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন " (ভগবদ্‌গীতা ৮ ৬) আত্মউপলব্ধি সম্বন্ধ যে চিন্ময় আত্মা অনন্ত চিন্ময় জগতে প্রবেশ করে তার এই অনিত্য জড় জাগতিক জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির পুনর্জন্ম প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কোন বাসনাই থাকে না

পুনর্জন্ম বিষয়ে গবেষণায় গতজন্মের স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রে একটি তথ্য প্রায়ই প্রকাশ হয় যে একই আত্মা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শরীরে অবস্থান করে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সম্মোহিত অবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের পূর্বজন্মের স্মৃতিচারণ করার সময় যেসব তথ্য দিয়েছেন সেগুলি বিস্ময়করভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে কখনও বা এইসব পূর্বস্মৃতি থেকে এমন সব গভীর ভাবানুভূতি প্রকাশ হয় যা সন্দেহাতীত আমেরিকার আয়ান স্টিফেনশান ও অস্ট্রেলিয়ার পিটার রামস্টার পুনর্জন্ম সম্পর্কিত

পরীক্ষাগুলির তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা কতখানি তা বের করার জন্য আলাদাভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়েছিল উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা গিয়েছিল যে কয়েকজন তাদের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে যেসব ভাষায় অনর্গল কথা বলেছিলেন সেসব বিষয়ের সাথে তাদের সারা জীবনে কিছু মাত্র সংযোগ ছিল না এমনকি কয়েকজন এমন প্রাচীন ভাষায় কথা বলেছিল যার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে কিন্তু প্রাচীনকালে সেইসব ভাষার প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া গেছে

রামস্টার যাদের নিয়ে কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন তাকে ও অন্য কয়েকজনকে বিদেশে কিছু বাড়ি দেখিয়েছিলেন, যেখানে সেইসব ব্যক্তিরা কখনও যাননি আবার অনেকে তাদের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যেসব বাড়ির বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলোর সাথে প্রকৃত বাড়িগুলো বা তার ধ্বংসাবশেষগুলোর বর্ণনা নিঃখুতভাবে মিলে গেছে এইসব তথ্যগুলি যাচাই করার অনেক আগেই রামস্টারের অফিসে রেকর্ড করা হয়েছিল

খুব যত্ন সহকারে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে এইসব পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছিল এইসব পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পুনর্জন্ম কোনও একভাবে ঘটে কিন্তু আত্মার দেহান্তর ঠিক কিভাবে ঘটে সেই বিষয়ে কোনও সুগভীর তত্ত্বজ্ঞান আমরা এই পরীক্ষাগুলোর থেকে পাই না। সুতরাং গতজন্মের পূর্বস্মৃতি জাগরণ পদ্ধতির মাধ্যমে পুনর্জন্মবাদ বা পুনর্জন্ম সম্পর্কিত কোনও তত্ত্ব পাওয়া যায় না এই পদ্ধতি অতি উন্নত স্তরের রহস্য উপলব্ধির একটি সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র তাছাড়া এইসব পরীক্ষার সাথে জড়িত সূক্ষ্ম অনুভূতি, অতিসরলীকরণ, বা বাকচাতুর্যের জন্য এই পদ্ধতিগুলি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ থাকে এর মাধ্যমে পুনর্জন্মের অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনও মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় না।

একবার মানুষ হলে সব সময় মানুষ?

পুনর্জন্ম সম্পর্কে আর একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস আছে যে আত্মা একবার মানব রূপে জন্মলাভ করলে পরবর্তী জন্মে আবার মানব শরীরেই ফিরে আসে। নিম্নতর জীব রূপে আর কখনই জন্ম লাভ করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা মানুষ হয়ে আবার জন্মাতে পারি, কিন্তু কুকুর, বেড়াল, শুয়োর বা নিম্ন প্রজাতির মধ্যেও ফিরে আসতে পারি। তবে উচ্চ বা নিম্ন যে শ্রেণীর জীবের শরীরেই প্রবেশ করুক না কেন আত্মা অপরিবর্তিত থাকে। ইহজন্মে যে ধরনের চেতনা গড়ে ওঠে, কর্মফলের অভ্রান্ত নীতি অনুসারে জীবের পরজন্মে সেইমতো কি ধরনের শরীর লাভ হবে তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। পুনর্জন্ম সম্পর্কিত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ ভগবদ্গীতায় ভগবান স্বয়ং স্পষ্টই বলেছেন 'রজোগুণে মৃত্যু হলে কর্মাসক্ত মনুষ্যকুলে জন্ম হয়, তেমনই তমোগুণে মৃত্যু হলে পশুযোনিতে জন্ম হয়।' 'একবার মানুষ হলে সবসময় মানুষ'—এই যে ধারণাটি পুনর্জন্মের যথার্থ নীতির বিরুদ্ধে প্রচলিত আছে সেটির কোনও শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ কোথাও নেই। এটি পুনর্জন্ম বিষয়ক বাস্তব নীতির বিরোধী, যে বাস্তব নীতি অবিস্মরণীয় কাল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপলব্ধি করেছে এবং মেনে চলেছে।

মৃত্যু ব্যাথা বেদনাহীন উত্তরণ নয়

অনেক বইতে মৃত্যুকে মনোরম এবং পরম শান্তির পথ বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এই ধরনের বইগুলো সাধারণ মানুষকে ভীষণভাবে বিভ্রান্ত করে, লেখকরা মৃত্যুকে মনোরম ব্যাথা বেদনাহীন পর্যায়রূপে চিহ্নিত করেন। সেইসাথে তারা জীবনের এই অন্তিম পর্যায়কে সচেতনতা ও প্রশান্তির এক প্রচেষ্টা বলে দেখিয়েছেন।

পুনর্জন্মবাদী তাত্ত্বিকরা আমাদের বিশ্বাস করাতে চান যে কিছু সময়ের জন্য আমরা মহাবিশ্বে নিদ্রা লাভ করব। যার ফলে আমরা এক মনোরম চলমান ভাসমান অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করব। যেন আমাদের আত্মা ক্রমশ তার পরবর্তী মানব শরীরে এগিয়ে চলেছে। এই পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর। এরা আরও বলে যে এরপর আমরা কোনও মানব জঠরে প্রবেশ করব। যেখানে বাইরের পৃথিবীর নিষ্ঠুর পরিবেশ থেকে আমরা সুরক্ষিত থাকব এবং খুব আরামে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে থাকব। সবশেষে নির্দিষ্ট সময়ে আমরা জননীর আশ্রয় থেকে নিজেদের মুক্ত করে বাইরে বেরিয়ে আসব।

এইসব কিছু শুনে খুব আশ্চর্য লাগে। কিন্তু বাস্তব সত্য হল জন্ম ও মৃত্যু—দুটোই বিভ্রান্তিকর ও উদ্বেগজনক অভিজ্ঞতা। মহর্ষি কপিলমুনি তার জননীকে মৃত্যুর অভিজ্ঞতার যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন—"সেই রুগ্ন অবস্থায়, ভিতরের বায়ু চাপে, তার চক্ষু ঠিকরে বেরিয়ে আসে এবং কফের দ্বারা তার শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে যায়। তার নিঃশ্বাস নিতে তখন খুব কষ্ট হয় এবং তার গলা দিয়ে 'ঘুর ঘুর' শব্দ বের হয়। সে অসহ্য বেদনায় অচেতন হয়ে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।" কিন্তু আত্মা দেহের মধ্যে বাস করতে করতে এতই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে মৃত্যুর মুহূর্তে তাকে প্রকৃতির বিধিনিয়ম অনুসারে জোর করে দেহের বাইরে বের করতে হয়। ঠিক যেমন কাউকে তার নিজের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়, তেমনই আত্মাকে জোর করে আত্মাকে জড়দেহের বাইরে বের করা হয়। এই উচ্ছেদের সময় স্বভাবতই আত্মা বাধা দেয়। এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গগুলিও মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশ্চর্যজনক ক্ষমতা ও কৌশল দেখায়। কিন্তু সকল জীবেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আর এই মৃত্যুর সাথে জড়িয়ে থাকে ভয়, ব্যাথা ও বেদনা।

বৈদিক গ্রন্থাবলি থেকে আমরা জানতে পারি যে কেবলমাত্র আত্মসচেতন ও মুক্ত আত্মাই শুধুমাত্র উদ্বিগ্নহীনভাবে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। এটি সম্ভব কারণ এইসব সমুন্নত ব্যক্তিসত্তারা তাদের অনিত্য দেহরূপ থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ পৃথক ভাবতে পারেন। তারা সত্ত্ব জ্ঞানে নিবদ্ধ থাকেন। তারা মনে করেন যে তারা এক সচ্চিদানন্দ চিন্ময় আত্মা যে আত্মা সকল জড় শরীরের থেকে স্বাধীন যেসব আত্মা এইরূপ ভাবাপন্ন হয় তারা অবিরাম চিন্ময় আনন্দে থাকে মৃত্যুকালে কোনও রকম যন্ত্রণা বা শরীর পরিবর্তনে তারা উদ্বিগ্ন হয় না।

কিন্তু জড় জগতে জন্ম নেওয়া কোনও আনন্দের ব্যাপার নয় এই জন্ম নেওয়ার জন্য মানব ভ্রূণকে বেশ কয়েক মাস মাতৃগর্ভের অন্ধকারে গুটিয়ে থাকতে হয়। সেইসাথে জননীর জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে তাকে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করতে হয়। মাতৃ জঠরে একটি ছোট্ট থলির মধ্যে ভ্রূণ অবিরাম চাপে থাকে। থলিটি দৃঢ় বদ্ধ সংকোচনশীল হওয়ায় ভ্রূণকে পৃষ্ঠদেশ সবসময় ধনুকের মতন বেঁকিয়ে রাখতে হয়। মাতৃ জঠরে ভ্রূণকে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জরিত হতে হয় জঠরের মধ্যের ক্ষুধার্ত কীটানুগুলি ভ্রূণের শরীরকে দংশন করে। সেই দংশন জ্বালাও সহ্য করতে হয়। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে জন্মলাভ এমনই কষ্টকর যে গতজন্মের স্মৃতিগুলো এই প্রক্রিয়ার ফলে মুছে যায়

বৈদিক শাস্ত্রে এও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে মানব জন্ম অতি দুর্লভ বলতে গেলে এই জড় জগতে অধিকাংশ জীবই মানব ছাড়া অন্য যেকোনও রূপে জন্মগ্রহণ করেছে এইরকম ঘটে থাকে, আত্মা যখন মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য আত্মউপলব্ধিকে বর্জন করে পশুসুলভ আকাঙ্খায় জড়িয়ে পড়ে। যার জন্য সেই আত্মাকে পরজন্মে পশু বা পশুর চেয়েও নিম্নযোনির কোনও প্রাণী রূপে জন্ম নিতে হয়

জনপ্রিয় বাজার চলতি সাহিত্যগুলোয় পুনর্জন্মের তত্ত্বগুলোকে বর্ণনা করা হয় কতগুলি বিশ্বাস, মতামত, ভাবধারা ও নিতান্ত কল্পনারূপে।

জড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মনীতি অনুসারে চলে আবার কিছু নিয়মাবলি আছে যা সূক্ষ্ম জগতকে পরিচালিত করে এই নিয়মনীতির মধ্যে রয়েছে আত্মা এবং কর্মের পুনর্জন্মের বিষয়টিও। ভগবদ্গীতা এবং শতশত অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে এইসব সূক্ষ্ম অথচ সুদৃঢ় প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নিয়ম অনুসারেই পুনর্জন্ম প্রক্রিয়াটি হয়ে থাকে এই নিয়মনীতিগুলো কিন্তু আকস্মিকভাবে কারও ইচ্ছায় তৈরী হয়নি। এগুলো পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্রিয়াকর্ম, যা গীতায় (৯/১০) বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে –"আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা জড়া প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।"

পুনর্জন্ম সম্বন্ধে যেসব ভাবধারা সুপ্রচলিত রয়েছে সেগুলি হয়ত আমাদের মনমত আর শুনতেও ভাল লাগে। কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবনের লক্ষ্য অনেক বেশী মূল্যবান তাই আমরা কিন্তু এইসব শিশুসুলভ অতিসরলিকৃত এইসব বিভ্রান্তিকর প্রচলিত নীতিতে আমাদের বিশ্বাসকে আটকে রাখতে পারি না। যদিও এইসব প্রচলিত নীতিগুলোই আমাদের কাছে অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক

অথচ হাজার হাজার বছরের পুরোন বৈদিক শাস্ত্রগুলোতে পুনর্জন্মের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের বাস্তব সর্বাঙ্গীন এবং কার্যকরী জ্ঞান যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা আছে এই জ্ঞানের মাধ্যমে বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ক্রমশ আত্মসচেতনতার পর্যায়ে এগিয়ে চলা সম্ভব। যার ফলে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত চক্র থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে। মানব জন্মের এটাই যথার্থ লক্ষ্য।

পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর অনিঃশেষতা থেকে আমাদের নিজেদের মুক্ত করতে হলে আমাদের অবশ্যই কর্মের বিধানরূপ পুনর্জন্মকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে

৮

আবার ফিরে এসো না

প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিরা বলেছেন, মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল পুনর্জন্মের অবিরাম (endless) চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া। তাঁরা সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে বলেছেন, আবার ফিরে এসো না।

মোটামুটিভাবে ব্যাপারটি হল জীব মাত্রই যেকোনওভাবে জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে আবদ্ধ হয়ে আছে। ঠিক যেমন বলা যায় প্রাচীন করিন্থ দেশের রাজা গ্রীকবীর শিশুপাসের ঘটনাটি। শিশুপাস একবার দেবতাদের পরাভূত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কখনই তিনি যুদ্ধ জয়ের সৌভাগ্য লাভ করেননি। তাকে একটি পাহাড়ের ওপারে বিশাল একটি প্রস্তরখণ্ডকে গড়িয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারেই যখন পর্বতের চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছত তখনই সেটা গড়িয়ে পড়ে যেত। তাই বারবার শিশুপাসকে এই ধাক্কাটি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। ঠিক তেমনই যখন কোন জীব জড় জাগতিক পৃথিবীতে তার জীবনকাল শেষ করে তখন পুনর্জন্মের নিয়ম অনুসারে তাকে অবশ্যই আর একটি জীবন শুরু করতে হয়। আর প্রত্যেক জীবনেই জড়জাগতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। যদিও তার এইসকল প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং তাকে অবশ্যই আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে হয়।

সৌভাগ্যবশত, আমরা শিশুপাস নই। আবার জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তন চক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি পথও আমাদের রয়েছে। এই পথের প্রথম ধাপই হল "আমি আমার এই শরীরটি নই"—এই

জ্ঞান অর্জন এবং উপলব্ধি করা বেদে বলা হয়েছে, *অহম ব্রহ্মাস্মি*—অর্থাৎ "আমি হলাম শুদ্ধ আত্মা " প্রত্যেক জীবাত্মার সাথেই পরম আত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি সম্পর্ক রয়েছে, যেকোনও স্বতন্ত্র জীবাত্মার সাথে স্ফুলিঙ্গের তুলনা করা চলে স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নি থেকে উৎপন্ন হয় তেমনি প্রতিটি জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ অগ্নি এবং স্ফুলিঙ্গ যেমন একই গুণসমৃদ্ধ তেমনি প্রতিটি জীবাত্মা পরমাত্মার ন্যায় চিৎ-গুণ সমৃদ্ধ উভয়েই সৎ-চিৎ-আনন্দময় সকল জীবাত্মাই চিৎ-জগতে পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবকরূপে বিরাজ করে কিন্তু যখনই কোন জীবাত্মা তাঁর এই সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয় তখনই সে জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন চক্রে প্রবেশ করে এবং কর্মফল অনুযায়ী বিভিন্ন শরীর ধারণ করতে থাকে।

পুনর্জন্মের এই চক্র থেকে মুক্তি পেতে হলে কর্মফল এর নীতি বিশদভাবে অনুধাবন করতে হবে 'কর্ম' একটি সাংস্কৃতিক শব্দ এর অর্থ আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নীতিটির মতন। অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ার যেমন সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তেমনি প্রতিটি জীবাত্মাকেই তার কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করতে হবে কখনও আমরা বলি, 'ঘটনাটি আমার কাছে ঘটেছিল' আমরা সাধারণ বুদ্ধি বলে মনে করে থাকি ভালমন্দ যা কিছু আমাদের জীবনে ঘটছে তার জন্য আমরা কিছু না কিছু দায়ি যদিও সেই ঘটনাগুলির যথার্থতা আমাদের ধারণার বাইরে দুর্মতিপূর্ণ মানুষদের দুঃখময় এই দুর্ভাগ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে সাহিত্যের অনুরাগীরা একে 'কাব্যিক সুবিচার' বলে অভিহিত করে থাকেন ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনাকে 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু কর্মের নীতি এই সকল অস্পষ্ট সূত্র এবং প্রবাদের ঊর্ধ্বে এই নীতি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার বিজ্ঞানকে ঘিরে গঠিত বিশেষত এই নীতি যখন পুনর্জন্মের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে থাকে এই জন্মেই

আমরা আমাদের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম দিয়ে পরবর্তী জন্মে কি ধরনের শরীর প্রাপ্ত হব তা নির্দিষ্ট করে ফেলি

মানব জীবন খুবই দুর্লভ, বহু লক্ষ প্রজাতির শরীর পাওয়ার পর আত্মা মানব জীবন লাভ করে। একমাত্র মনুষ্য জীবনেই আত্মার কর্মফল উপলব্ধি করার মতন বুদ্ধি থাকে যার জন্য একমাত্র মনুষ্য জন্মেই আত্মা পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে জাগতিক দুঃখ দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে একমাত্র মানুষই তাই যে ব্যক্তি তার এই মনুষ্য জীবনের অপব্যবহার করছে এবং আত্ম উপলব্ধির বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছে না সে মনুষ্য জীবন লাভ করলেও কুকুর অথবা গাধা থেকে কিছুমাত্র উন্নত প্রাণী নয়

কর্মের প্রতিক্রিয়া ধুলোর মতন যে ধুলো আমাদের প্রকৃত, বিশুদ্ধ, আধ্যাত্মিক চেতনার দর্শনকে ঢেকে রেখেছে কিন্তু এই বাধাকে কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমেই দূর করা যায় সংস্কৃত ভাষায় এই মন্ত্রটি ভগবানের নাম দিয়ে গঠিত—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মন্ত্র কর্মের প্রভাব থেকে আমাদের মুক্ত করতে কতখানি শক্তিশালী তার বর্ণনা বৈদিক গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় পুরাণের নির্যাসস্বরূপ শ্রীভাগবতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—'আনমনা ভাবেও শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম কীর্তন করলে জন্ম ও মৃত্যুর জটিল জালে আবদ্ধ জীবও তৎক্ষণাৎ মুক্তি পেয়ে থাকে '

বিষ্ণু ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, 'কৃষ্ণ শব্দটি এমনই শুভপ্রদ যে এই পবিত্র নাম কেউ উচ্চারণ করা মাত্রই বহু বহু জন্মের পাপ কর্মফল থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করে।' আর বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রচার করছে যে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র বর্তমান কলিযুগ থেকে মুক্তি লাভের সহজ পন্থা

যথাযথ ফললাভের জন্য, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কোনও প্রকৃত সদ্‌গুরুর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হয়, যিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যদের কাছ থেকে গুরু পরম্পরা ধারায় দীক্ষিত হয়েছেন। এইরকম উপযুক্ত গুরুর কৃপায় যে কেউ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলেছেন— কর্ম অনুসারে সকল জীব সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করছে। তাদের কেউ কেউ উচ্চ গ্রহলোকে উন্নীত হয় এবং কেউ কেউ নিম্ন গ্রহলোকে পতিত হয়। এভাবে ভ্রমণরত লক্ষ লক্ষ জীবের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান তাঁরা কৃষ্ণের কৃপায় সদ্‌গুরুর সঙ্গ লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন।"

কিভাবে প্রকৃত গুরুর সন্ধান পাওয়া যাবে? এজন্য প্রথমে জানতে হবে সদ্‌গুরু পরম্পরার ধারায় আসেন। তিনি পরম্পরা ধারায় শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাই শিষ্যদের দান করেন। প্রকৃত গুরু তাঁর গুরুর বাণী বিকৃত করেন না। তিনি কখনও পরম্পরার বাণী পরিবর্তন করেন না। সদ্‌গুরু পরম্পরা ধারায় প্রাপ্ত সকল বাণীকে যথাযথভাবে বিতরণ করেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, পূর্বতন আচার্যদের প্রতিনিধি। প্রকৃত গুরু আমিষ আহার, মদ্যপান, জুয়া খেলা অথবা অবৈধ সম্পর্কের মতন পাপপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকেন এবং সদাসর্বদা ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ঠিক এরকমই কোন সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হলে পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। জড় জগতে অবস্থিতি এবং জন্ম-মৃত্যুর এই আবর্তন চক্র এক বিশাল সমুদ্রের মতন। সেখানে মনুষ্য জীবন একটি জাহাজের মতন যা দিয়ে এই বিশাল সমুদ্রকে অতিক্রম করা সম্ভব। সদ্‌গুরু হলেন এই জাহাজের নাবিক। তিনিই শিষ্যদের এই বিশাল সমুদ্র অতিক্রম করে নিত্য আলয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রকৃত নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ একবার লিখেছিলেন, "যেকোনও সদ্‌গুরুই একটি বিশাল দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, শিষ্যদের পরিচালিত করে পরম পদ বা অমরত্ব লাভের যোগ্যতা প্রদান করা। তাছাড়াও গুরুদেবের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, দক্ষতা সহকারে শিষ্যকে তার প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।" সদ্‌গুরু এই আশ্বাসও দিয়ে থাকেন যে একজন যদি কোন কিছু না করে কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথাই শ্রবণ করেন, তবে তিনিও পুনর্জন্মের আবর্তন চক্র থেকে মুক্তি পাবেন।

কর্ম ও পুনর্জন্মের থেকে মুক্ত হওয়ার বাস্তব শিক্ষা

মন ও ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য কাজকর্মগুলিই মানুষের জড় বন্ধনের কারণ। এইসব কাজের ফলও মানুষকে ভোগ করতে হয়। অর্থাৎ যতদিন মানুষ এইসব কর্ম করে ততদিন আত্মাকেও জন্মজন্মান্তরে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করে যেতে হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঋষভদেব রূপে আবির্ভূত হয়ে সতর্ক করে বলেছিলেন, "জীব যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে, তখন সে অবশ্যই জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি উন্মাদের মতো আসক্ত হয়ে নানাপ্রকার পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সে জানে না যে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে একটি শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা অনিত্য এবং সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। প্রকৃতপক্ষে জীবের জড় দেহ ধারণ করার কথা নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষা করার ফলে, সে জড় দেহ লাভ করে। তাই, আমি মনে করি যে, বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যার ফলে সে একটির

পর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে অভিলাষ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে পরাস্ত হয়ে অবিদ্যাজনিত ক্লেশ ভোগ করে। পাপ অথবা পুণ্য উভয় প্রকার কর্মই কর্মফল উৎপন্ন করে। যে কোন প্রকার কর্মে রুচি থাকলেই মন কর্মাত্মক হয়, অর্থাৎ সকাম কর্মের বাসনায় আসক্ত হয়। মন যতক্ষণ কলুষিত থাকে, ততক্ষণ চেতনা আচ্ছাদিত থাকে এবং তার ফলে জীব সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তাকে একের পর এক জড় দেহ ধারণ করতে হয়। জীব যতক্ষণ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ সে আত্মা এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তার মন তখন সকাম কর্মে বশীভূত থাকে। তাই যতক্ষণ না ভগবানের প্রতি প্রীতির উদয় হয়, ততক্ষণ সে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/৪-৬)

জীব শুধু জড় দেহ নয়, জীব হল প্রকৃতপক্ষে আত্মা—শুধু এই তত্ত্বটি জানলেই জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তন চক্র থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না। প্রত্যেককেই শুদ্ধ আত্মার ভূমিকা পালন করতে হবে।

একেই বলে ভক্তি অনুশীলন। এই ভক্তি অনুশীলনের কতগুলি নিয়মনীতি বা পন্থা রয়েছে। সেগুলি হল—

১। ভক্তি অনুশীলনের প্রথম নীতি হল সবসময় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

২। বিশেষত ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত-এর মতন বৈদিক শাস্ত্র নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে। যাতে আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে কর্মের বিধিনিয়ম, পুনর্জন্মের প্রক্রিয়া এবং আত্ম উপলব্ধির পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করা যায়।

৩। শুধুমাত্র ভক্তিভাবাপন্ন চিন্ময় সাত্ত্বিক নিরামিষ আহারই গ্রহণ করতে হবে। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যজ্ঞাহুতির মাধ্যমে তাকে নিবেদিত আহারই গ্রহণ করা উচিত। নইলে মানুষকে কর্মফলের বন্ধনে জড়াতে হবে।

> *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।*
> *তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥*

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি"। (গীতা ৯/২৬)

এই শ্লোক থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভগবান মদ, মাংস, মাছ কিংবা ডিম তাঁকে ভক্তিসহকারে নিবেদন করা হোক—চান না। শুধুমাত্র প্রেমভক্তি সহকারে প্রস্তুত নিরামিষ সাধারণ আহারই তিনি চান।

আমাদের চিন্তা করা উচিত যে কারখানার শ্রমিকরা আহার প্রস্তুত করতে পারে না। তারা যেগুলো প্রস্তুত করে যেমন গ্যাসোলিন, প্লাস্টিক, মাইক্রোচিপস বা স্টিলকে মানুষ খেতে পারে না। ভগবানের নিজস্ব প্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেবল খাবার প্রস্তুত হয়। সেইসকল আহার্যদ্রব্যকে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদনের মাধ্যমেই ভগবানের কাছে আমরা ঋণ স্বীকার করতে পারি। ভগবানকে মানুষ কিভাবে এই আহার্য নিবেদন করতে পারে? খুবই সহজ ও সরল পদ্ধতিতে এটি করা যায়। ভগবান এবং গুরুদেবের একটি প্রতিকৃতিকে যেকেউ

পর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে অভিলাষ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে পরাস্ত হয়ে অবিদ্যাজনিত ক্লেশ ভোগ করে। পাপ অথবা পুণ্য উভয় প্রকার কর্মই কর্মফল উৎপন্ন করে। যে কোন প্রকার কর্মে রুচি থাকলেই মন কর্মাত্মক হয়, অর্থাৎ সকাম কর্মের বাসনায় আসক্ত হয়। মন যতক্ষণ কলুষিত থাকে, ততক্ষণ চেতনা আচ্ছাদিত থাকে এবং তার ফলে জীব সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তাকে একের পর এক জড় দেহ ধারণ করতে হয়। জীব যতক্ষণ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ সে আত্মা এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তার মন তখন সকাম কর্মে বশীভূত থাকে। তাই যতক্ষণ না ভগবানের প্রতি প্রীতির উদয় হয়, ততক্ষণ সে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/৪-৬)

জীব শুধু জড় দেহ নয়, জীব হল প্রকৃতপক্ষে আত্মা—শুধু এই তত্ত্বটি জানলেই জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তন চক্র থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না। প্রত্যেককেই শুদ্ধ আত্মার ভূমিকা পালন করতে হবে।

একেই বলে ভক্তি অনুশীলন। এই ভক্তি অনুশীলনের কতগুলি নিয়মনীতি বা পন্থা রয়েছে। সেগুলি হল—

১। ভক্তি অনুশীলনের প্রথম নীতি হল সবসময় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

২। বিশেষত ভগবদ্‌গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত-এর মতন বৈদিক শাস্ত্র নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে। যাতে আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে কর্মের বিধিনিয়ম, পুনর্জন্মের প্রক্রিয়া এবং আত্ম উপলব্ধির পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করা যায়।

৩। শুধুমাত্র ভক্তিভাবাপন্ন চিন্ময় সাত্ত্বিক নিরামিষ আহারই গ্রহণ করতে হবে। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যজ্ঞাহুতির মাধ্যমে তাকে নিবেদিত আহারই গ্রহণ করা উচিত। নইলে মানুষকে কর্মফলের বন্ধনে জড়াতে হবে।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি"। (গীতা ৯/২৬)

এই শ্লোক থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভগবান মদ, মাংস, মাছ কিংবা ডিম তাঁকে ভক্তিসহকারে নিবেদন করা হোক—চান না। শুধুমাত্র প্রেমভক্তি সহকারে প্রস্তুত নিরামিষ সাধারণ আহারই তিনি চান।

আমাদের চিন্তা করা উচিত যে কারখানার শ্রমিকরা আহার প্রস্তুত করতে পারে না। তারা যেগুলো প্রস্তুত করে যেমন গ্যাসোলিন, প্লাস্টিক, মাইক্রোচিপস বা স্টিলকে মানুষ খেতে পারে না। ভগবানের নিজস্ব প্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেবল খাবার প্রস্তুত হয়। সেইসকল আহার্যদ্রব্যকে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদনের মাধ্যমেই ভগবানের কাছে আমরা ঋণ স্বীকার করতে পারি। ভগবানকে মানুষ কিভাবে এই আহার্য নিবেদন করতে পারে? খুবই সহজ ও সরল পদ্ধতিতে এটি করা যায়। ভগবান এবং গুরুদেবের একটি প্রতিকৃতিকে যেকেউ

তার ঘরে একটি বেদীর ওপর স্থাপন করতে পারে। সেই প্রতিকৃতির সামনে ভক্তিসহকারে সেই আহার্য নিবেদন করে সে বলবে "হে কৃষ্ণ, কৃপা করে এই সামান্য নিবেদন গ্রহণ করুন।" এরপর তাকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। এই সহজ পদ্ধতির মূল বিষয়টি হল ভক্তি। মনে রাখবেন, ভগবান খাদ্যের জন্য ক্ষুধার্ত নন। তিনি চান কেবল আমাদের প্রেম ও ভালবাসা। ভগবানকে নিবেদিত পবিত্র শুদ্ধ আহার্য সামগ্রী গ্রহণ করলে মানুষও তাঁর কর্মফল থেকে মুক্তিলাভ করে। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদস্বরূপ এই আহারই মানুষকে জড়জাগতিক সংক্রমণ থেকে নিবৃত্ত করে।

৪। বিভিন্ন ধরনের শাকসব্জী, ফলমূল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদনই হল বাস্তবমুখী নীতি। এর মাধ্যমেই মানুষ অতি সহজে মাছ, মাংস, ডিম এর মতন আমিষ খাদ্য আপনা আপনি পরিহার করতে পারে। আমিষ আহার বর্জনের নীতি সকলেরই গ্রহণ করা উচিত। কারণ এই ধরনের আমিষ আহার মানেই অনাবশ্যকভাবে অন্য জীব হত্যা করা। যার জন্য ইহজন্মে বা পরজন্মে অপকর্মের প্রতিফল ভোগ করতে হয়। কর্মফলের নীতিতে বলা হয়েছে, কেউ যদি আহারের জন্য পশুহত্যা করে, তবে পরজন্মে সেই পশুহত্যাকারিকেও একইভাবে হত্যা করে আহার করা হবে। অন্যদিকে গাছপালার জীবন হরণের মধ্যেও কর্মফল থাকে। তবে গাছপালা থেকে প্রাপ্ত নিরামিষ খাদ্যকে যদি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়, তবে তার কর্মফল নষ্ট হয়ে যায়। কারণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি ঐ ধরনের শাকাহার নিবেদন গ্রহণ করবেন। শুধুমাত্র আমিষ আহারই নয়, সেইসাথে কফি, চা, মাদক দ্রব্য, তামাক সহ সবরকম উত্তেজক বস্তুও বর্জন করা উচিত। যেকোনও নেশাভ্যাস করা মানেই তমোগুণের সাথে জড়িত হওয়া। যার ফলে এই জন্মের মানুষকে পরজন্মে ইতরজন্মও গ্রহণ করতে হতে পারে।

৫। পুনর্জন্মের এই চক্র থেকে মুক্তিলাভের আরও একটি পন্থা হল, ভগবানের উদ্দেশ্যে নিজের সকল কর্মফলকে নিবেদন করা। নিজের জীবন রক্ষার জন্য প্রত্যেকেরই কাজকর্ম করা উচিত। কিন্তু যদি কেউ নিজের সুতৃপ্তির জন্য কাজ করে তবে তাকে অবশ্যই কর্মফল ভোগ গ্রহণ করতে হবে। যার ফলে তার ভবিষ্যত জন্মে সেই কর্মের শুভ ও অশুভ প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হবে। ভগবদ্‌গীতায় সতর্ক করে বলা হয়েছে যে ভগবানের সন্তুষ্টির জন্যই শুধু কাজ করতে হবে। এই কাজ হবে ভগবৎ সেবা। এটি কর্মফলবিহীন। কারণ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে কাজের অর্থই হল সেবা নিবেদন। যার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টির জন্যই প্রত্যেক মানুষের তার সময় ও অর্থ অবশ্যই নিবেদন করা উচিত। ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, "বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত, তা না হলে কর্মই এই জড় জগতে বন্ধনের কারণ।" (ভগবদ্‌গীতা ৩/৯)

ভগবৎ সেবামূলক কাজকর্ম নিবেদনের মাধ্যমে মানুষ কর্মফল থেকেই যে শুধু নিষ্কৃতি লাভ করে তাই নয়, ক্রমশ সে ভগবানের উদ্দেশ্যে অপ্রাকৃত প্রেমময় সেবার স্তরে উন্নিত হতে থাকে—ভগবৎ ধামে প্রবেশের চাবিকাঠি সেটাই।

তবে এর জন্য কারও জীবিকা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না।" যিনি পেশায় লেখক তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য কিছু লিখতে পারেন। যিনি শিল্পী তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য চিত্রাঙ্কন করতে পারেন আবার রন্ধনবিদ হলে শ্রীকৃষ্ণের জন্য রান্না করতে পারেন। তবে যদি কেউ সরাসরি তার গুণ বা যোগ্যতা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করতে সক্ষম না হন, তবে তার অর্জিত অর্থের কিছু অংশ তার কাজকর্মের ফলস্বরূপ জগৎব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত প্রসারের সহায়তায় নিবেদন করতে পারেন। তবে অবশ্যই সৎ উপায়ে উপার্জন করা উচিত। যেমন কসাই বা

জুয়াড়ী হয়ে কখনই অর্থ উপার্জন করা উচিত নয়। এইসব পেশা মানুষের মন ও ইন্দ্রিয়কে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই ধরনের ফলাশ্রয়ী পেশায় যতদিন নিয়োজিত থাকা যায় ততদিন আত্মাকে ক্রমাগত জন্ম-জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করতে হয়।

৬। ভগবৎ-চেতনার মধ্যেই সন্তানদের বড় করে তোলা বাবা-মায়ের অবশ্য কর্তব্য। বেদে বলা হয়েছে বাবা-মা তাদের সন্তানের সকল কর্মফলের জন্য দায়ী। অন্যভাবে বলা যায় আপনার সন্তান যদি কুকর্ম করে তবে তার ফল আপনাকেও ভোগ করতে হবে। তাই ভগবানের নিয়মাধি মেনে চলার উপযোগিতা বাবা-মায়েরই প্রথম থেকে অবশ্যই সন্তানকে শেখানো উচিত। সেই সাথে কিভাবে ভগবানের প্রতি ভালবাসা গড়ে তুলবে তাও শেখানো উচিত। যাতে তারা পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে পারে। সব মিলিয়ে বলা যায় কর্মফল ও পুনর্জন্মের সূক্ষ্মনীতিগুলোর সাথে সন্তানদের ওতপ্রোতভাবে পরিচয় করানো বাবা-মায়ের অবশ্য কর্তব্য।

৭। যারা কৃষ্ণভাবনাময় রূপে জীবন অতিবাহিত করছেন তাদের কখনই অবৈধ মৈথুন জীবনে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ সন্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া মৈথুন করা উচিত নয়। বিবাহ বহির্ভূত মৈথুন পরিহার করা উচিত। সেইসাথে মনে রাখতে হবে গর্ভপাতের মাধ্যমে এক বিশেষ কর্মফল বাহিত হয়। যারা গর্ভপাত করে এই কাজে সাহায্য করে তারা পরবর্তী জন্মে এমন জননী গর্ভে স্থাপিত হতে পারে, যে গর্ভপাতের নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে তাদেরও জন্মের আগেই হত্যার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু কেউ যদি এই ধরনের পাপকর্মে লিপ্ত না হতে মনস্থির করে বা এর প্রতিফল ভোগ করতে না চায়। তবে তাকে ভগবানের পবিত্র নাম ভক্তিভরে জপ করতে হবে। তবেই তিনি সেই কর্মফল থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

৮। যারা কর্মফলের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন এবং জন্ম মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হতে চাইছেন, তাদের সাথেই নিয়মিত সঙ্গলাভ করতে হবে। কারণ এরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার চিন্ময় নিয়মনীতি মেনে চলেন। এই নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এরা জীবন অতিবাহিত করেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেন এবং যথার্থ পারমার্থিক কার্য করে থাকেন। এর জন্যই রুগ্ন মানুষের সংস্পর্শে থাকলে যেমন কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন তেমনি কৃষ্ণভক্তের সংস্পর্শে থাকলে প্রত্যেকের নিজস্ব চিন্ময় গুণাবলী উজ্জীবিত হয়ে থাকে।

এইসব সরল পদ্ধতিগুলি মেনে চললে যে কেউ কর্মফলের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে। অন্যথায় জড় জীবনের কর্মফলের বন্ধনে অবশ্যই মানুষকে জড়িয়ে পড়তে হয়। প্রকৃতির বিধিনিয়মগুলি অতি কঠোর। দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ মানুষই এসব জানে না। কিন্তু এই বিধিনিয়মের অজ্ঞতার জন্য কোন ক্ষমা নেই। যেমন খুব জোরে গাড়ি চালনার জন্য যদি কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়, তবে সে যদি বিচারকের কাছে বলে যে গাড়ি চালানোর সীমা তার জানা ছিল না, তাহলে কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হয় না। স্বাস্থ্যবিধিগুলো কেউ যদি না জানে তবে রোগব্যাধি কিন্তু তাকে রেহাই দেয় না। না জানার জন্য যদি কোন শিশু আগুনে হাত দেয় তবে তার হাত কিন্তু পুড়বেই। সেরকমই জন্ম ও মৃত্যুর অনন্ত চক্র থেকে মুক্ত হতে হলে কর্মফল এবং পুর্নজন্মের বিধিনিয়ম অবশ্যই আমাদের বুঝতে হবে। নতুবা এই জড়জাগতিক পৃথিবীতে বারে বারে আমাদের ফিরে আসতে হবে। সেইসাথে এটাও মনে রাখা দরকার সবসময় মনুষ্য জীবন আমরা নাও পেতে পারি।

বদ্ধ অবস্থায় আত্মা অনন্তকাল মহাকাল ও মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করে চলে। কর্মফলের মহাজাগতিক বিধিনিয়মের জন্য আত্মা জড় জাগতিক

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহে বিভিন্ন দেহ রূপ ধারণ করে বাস করে। কিন্তু আত্মা যেখানেই ভ্রমণ করুক না কেন তাকে একই অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন, "এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।"

গীতা এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থগুলো জীবনের যথার্থ লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দেয়। পুনর্জন্মের বিজ্ঞান বুঝতে পারলে আমরা কর্মবন্ধনের শক্তি থেকে মুক্ত হয়ে সৎ, চিৎ, আনন্দময় জগতে ফিরে যেতে পারব।
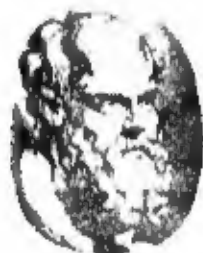
সক্রেটিস নেপোলিয়ন

এমারসন গান্ধী

চারজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যারা পুনর্জন্মের সত্যকে স্বীকার করেছিলেন।